মৃত্যুর পরে ও পুনর্জ্জন্মবাদ

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত প্রণীত

সন ১৩৪৮

[মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৬২ এল তিলভাণ্ডেশ্বর
বেনারস সিটি।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৬২ এল্ তিলভাণ্ডেশ্বর্
বেনারস সিটি।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমি
বেনারস-ব্রাঞ্চ হইতে মুদ্রি

প্রকাশকের কৈফিয়ৎ।

মানব সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতেছি যে মানুষ দিন দিন তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে যে সব বিষয়ের রহস্য আবিষ্কার করিতেছে এক সময় তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত।

জ্ঞান রাজ্যে মানুষের এই আবিষ্কারকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—মনোরাজ্যের ও বহির্জ্জগতের আবিষ্কার। নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে এই দুইটির মধ্যে প্রথমটির চর্চ্চা একদিন ভারতের এক চেটিয়া সম্পত্তি ছিল। একদিন ইহা এদেশে যে প্রকার উন্নতি করিয়াছিল, তাহা জগতের আর কোথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় না!

সে কালে ভারতের মনোরাজ্যে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটি আমাদের জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হিসাবে অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মৃত্যু রহস্য।

আমাদের মতে এই দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টির আলোচনা ও উহার রহস্য উদ্ঘাটন করা মানব জীবনে বিশেষভাবে আবশ্যক। 'ঈশ্বর কি, তিনি আছেন কি নাই' ইহা না জানিলেও আমাদের জীবন যাত্রার পথে বিশেষ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই বিশাল জগতের কোটী কোটী লোকের মধ্যে

ঈশ্বর সম্বন্ধে অসংখ্য মতামত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কোনটি যে ঠিক তাহা আমরা কেহই বলিতে পারি না—হইতে পারে হয়ত ইহাদের মধ্যে কোনটাই ঠিক নয়, কিন্তু তাহার জন্য কি কাহারও জীবনের পথে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইয়াছে? আদৌ নয়।

মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে কিন্তু কেহই বলিবে না যে মানব-জীবনে ইহা জানিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত হইতে অতি নিরক্ষর পর্য্যন্ত সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে জানিতে চায় 'মৃত্যু কি', 'মৃত্যুর পর মানুষের কি অবস্থা হয়', 'তাহাকে আবার এখানে ফিরিতে হয় কিনা' প্রভৃতি।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ সকল আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের সে কালের মুনি ঋষিরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে পরিমাণ আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে তাহার কিছুই করেন নাই।

সে কালের গভীর তত্ত্বদর্শী মুনি ঋষিরা কি জানিতেন না যে মানুষ মৃত্যু-রহস্য জানিবার জন্য কি প্রকার লালায়িত? খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ কোন সংবাদ দিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহাদের প্রায় সমস্ত সময় ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণয়ে নিয়োগ করিয়াছেন কেন? ইহা হইতেই পারে না যে যাঁহাদের ত্রিকালদর্শীতার শত শত উদাহরণ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাঁহারা মৃত্যু-রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই।

মৃত্যুর পরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূক্ষ্ম মূর্ত্তি

জগতের প্রাচীনতম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ধর্ম্মমত স্থাপিত হইয়াছে তাহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে যে মানবের জড়দেহের মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাহা তাহার মৃত্যুর পরও থাকিয়া যায়। এই জিনিসটাকে আমরা 'জীবাত্মা' বা সংক্ষেপে 'আত্মা' বলিয়া থাকি।

আমাদের জড়দেহের মধ্যে এই জীবাত্মা যত দিন অবস্থিতি করে, আমরা জীবিত। যে মুহূর্ত্তে আত্মা জড়-দেহ হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া যায়, আমাদের ইহ-লোকের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হয়।

আমার **ইহলোক ও পরলোক** পুস্তকে আমি স্পষ্ট-ভাবে দেখাইয়াছি ঠিক মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবাত্মা কেমন ধীরে ধীরে জড়দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। জীবাত্মা সাধারণতঃ ব্রহ্মতালুর পথে দেহ ত্যাগ করে। যে সময় জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিতে থাকে, তখন দেহীর ঠিক মস্তকের

উপর অতিসূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে থাকে। জড়দেহের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ একেবারে মিটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত এই নূতন মূর্ত্তির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। যে মুহূর্ত্তে জড়দেহের মৃত্যু হয়, ঐ নূতন মূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়া উহা মৃত জড়দেহের নিকট শূন্যে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। এই নূতন দেহ দেখিতে অবিকল মৃত জড়দেহের মত। ইহা অতি সূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত বলিয়া আমরা সচরাচর জড়চক্ষুতে উহা দেখিতে পাই না।

এই নূতন সূক্ষ্মদেহ জড়দেহ নাশের পর কত দিন পর্য্যন্ত এই জড়জগতে অবস্থিতি করে তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। অনেক সময় দেখা যায় জড়দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহার সূক্ষ্মদেহ অদৃশ্য হয়; আবার কখন কখন উহা নিজের পূর্ব্ব বাসস্থানের চারিদিকে বহুদিন পর্য্যন্ত ঘোরা ফেরা করে এবং নিজের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য উহা যে অসম্ভব তাহা সে শীঘ্রই বুঝিতে পারে।

জড়দেহের মৃত্যুর পর নূতন সূক্ষ্মদেহীর অবস্থার কথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য আমরা এখানে দুইটি ক্ষুদ্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলাম। পাঠক মনে রাখিবেন ইহা সত্য কাহিনী। সুপ্রসিদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দুইটি ঘটনাই স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। (১)

(১) গোস্বামীজির মত আমাদের দেশের আরও অনেকের এই প্রকার

১

আমি (বিজয়কৃষ্ণ) এক বৃদ্ধার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলাম। ইনি যে প্রকার পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাহা আমি খুব কমই দেখিয়াছি। এ-প্রকার লোকের মৃত্যু কি প্রকারে হয় তাহা দেখিবার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল বলিয়া আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়াছিলাম।

মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধঘন্টা পূর্ব্বে দেখিলাম বৃদ্ধার মস্তক হইতে একটি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতেছে। প্রথমে উহা খুব অস্পষ্ট (ছায়ার মত) ছিল। বৃদ্ধার জড়-দেহ যতই অবশ হইতে আরম্ভ হইল, ঐ মূর্ত্তি ততই স্পষ্ট হইতে লাগিল। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেখিলাম মূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু মুখের অংশ তখনও অনেকটা অস্পষ্ট—উহা যে কাহার মূর্ত্তি তাহা তখনও বুঝা যাইতে-ছিল না।

যে মুহূর্ত্তে বৃদ্ধার জড়দেহের মৃত্যু হইল, ঐ মূর্ত্তি ফটোর মত বেশ স্পষ্ট হইল—তখন বুঝিলাম উহা বৃদ্ধারই সূক্ষ্ম মূর্ত্তি। উহা বৃদ্ধারই মূর্ত্তি বটে, কিন্তু বৃদ্ধার জড়দেহের সহিত ইহার আকাশ পাতাল প্রভেদ। বৃদ্ধার প্রায় চুয়াত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ঐ বয়সে দেহ যেরূপ জরাজীর্ণ হয়

সূক্ষ্মদেহ দেখিবার ক্ষমতা ছিল ও আছে। সুপ্রসিদ্ধ এনি বেশান্ত আমাকে নিজে বলিয়াছিলেন যে এই ক্ষমতা থিওসফিষ্টদের মধ্যে অনেকের আছে।]

বৃদ্ধার জড়দেহের তাহা হইয়াছিল ; কিন্তু ঐ নূতন দেহে জরার চিহ্নমাত্র ছিল না। চুয়াত্তর বৎসর বয়সে এই জড়জগতে কাহারও চেহারা ঐ নূতন সূক্ষ্ম দেহের মত সুন্দর হইতে পারে না। সমস্ত দেহ হইতে এক প্রকার স্নিগ্ধ জ্যোতি বাহির হইতেছিল।

এই নূতন দেহ প্রকাশ হইবামাত্র দেখিলাম, কয়েকটি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আকাশ পথে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধার সূক্ষ্ম মূর্ত্তিকে লইয়া আকাশ পথে অনতিবিলম্বে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে জানিয়াছিলাম জড়জগতে যাহারা পবিত্র-ভাবে জীবন যাপন করে, তাহাদের সকলেরই এই বৃদ্ধার ন্যায় গতি হয়। মৃত্যুর পর মুহূর্ত্তে তাহারা এপারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে আমি আর এক জনের মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকিয়া সম্পূর্ণ অন্য প্রকার দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। এ লোকটা পুরুষ মানুষ, বয়স প্রায় ৫২।৫৩, সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মত সে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। স্বার্থের অনুরোধে অন্যায় কাজ করিতে মিথ্যা কথা বলিতে বা অন্যের অনিষ্ট করিতে তাহার কোনও আপত্তি ছিল না। বিনা প্রয়োজনে অবশ্য নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিত না।

প্রায় দেড় মাস কষ্ট পাইবার পর একদিন রাত্রি প্রায়

দুইটার সময় তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। উপরোক্ত বৃদ্ধার ন্যায় মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাহার সূক্ষ্মদেহ ধীরে ধীরে দেহীর মস্তকের উপর প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃদ্ধার সূক্ষ্মদেহ যে ভাবে গঠিত হইয়াছিল, এ লোকটার সূক্ষ্মদেহও ঠিক সেই ভাবে গঠিত হইল বটে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট পার্থক্যও দেখিয়াছিলাম। বৃদ্ধার প্রেত মূর্ত্তি গঠনের কাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, আমার মনে হইয়াছিল যেন উহা কোনও উৎকৃষ্ট মেসিনের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই পুরুষের মূর্ত্তি প্রকাশ হইবার সময় যেন নানাপ্রকার গোলোযোগ উপস্থিত হইল বলিয়া মনে হইল। মূর্ত্তির একই স্থান সম্পূর্ণ হইতে বার বার চেষ্টা হইতে লাগিল, তবুও যেন উহা সুসম্পন্ন হইল না। ইহা যেন কোনও আনাড়ি কারিগরের গঠিত মূর্ত্তি। ইহাদের মধ্যে আর এক বিশেষ পার্থক্য এই যে এই দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে কোনও প্রকার জ্যোতি ছিল না।

এই নূতন মূর্ত্তি সম্পূর্ণ গঠিত হইবার পর (অর্থাৎ উহার জড়দেহের মৃত্যুর পর), ইহাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনও দূত দেখিতে পাইলাম না। যে কক্ষের মধ্যে মৃত্যু হইয়াছিল উহারই ঠিক সম্মুখে এক দালানে ঐ লোকটার বিধবা স্ত্রী অতি করুণভাবে বিলাপ করিতেছিল। নূতন প্রেতাত্মার কানে বোধ হয় ঐ রোদন ধ্বনি উপস্থিত হইয়াছিল, কারণ হঠাৎ সে মৃতদেহের কক্ষ ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর দালানে উপস্থিত হইল।

ঐ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি একেবারে স্ত্রীর পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল "ওগো কেন কাঁদছ? আমিত কোথাও যাই নাই। এইত তোমার কাছে রহিয়াছি।" যখন দেখিল তাহার ঐ কথায় স্ত্রীর শোকের লাঘব হইল না, তখন কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়া দিল যে সে এখন প্রেতলোকে; তাহার কথা তাহার স্ত্রী শুনিতে পাইবে না, তাহার স্ত্রী তাহাকে দেখিতে পাইবে না। এদিকে স্ত্রীর করুণ আর্ত্তনাদ ক্রমান্বয়ে শুনিতে শুনিতে সে যেন অস্থির হইয়া পড়িল এবং তাহার স্ত্রী যাহাতে তাহার সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায় ও তাহার কথা শুনিতে পায় তাহার জন্য সে এমন প্রবল আগ্রহভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল যে তাহার স্ত্রী তাহার রোদনের মধ্যে হঠাৎ তাহার মৃত স্বামীর প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। প্রেত ইহা বুঝিতে পারিয়া অতি কোমল স্বরে বলিল, "দেখ, তুমি বৃথা শোক করিতেছ। আমার জড় দেহের মৃত্যু হইয়াছে মাত্র; কিন্তু আসল আমি যেমন ছিলাম ঠিক তেমনই আছি। তোমার—"

বিধবা হঠাৎ তাহার মৃতস্বামীর মূর্ত্তি একেবারে তাহার পাশে দণ্ডায়মান ও তাহাকে কথা বলিতে শুনিয়া আতঙ্কে দুই এক মুহূর্ত্ত পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল, তাহার পর ভয়ে "বাবারে, ভূতে খেয়ে ফেল্‌লোরে," বলিতে বলিতে ঝড়ের মত ঐ স্থান হইতে অদৃশ্য হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া প্রেত কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতভাবে থাকিবার পরে অস্ফুট স্বরে বলিল,

"আশ্চর্য্য! আমার জন্য শোক প্রকাশ একবারে মৌখিক! স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রী চায় না যে সে আবার ফিরিয়া আসে। স্ত্রী পরের মেয়ে—তাহার ভালবাসা আর কত হইতে পারে। মার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি। তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার হারাধনকে ফেরত পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন"।

প্রেতের জননী আর একটি ঘরে পুত্র শোকে গড়াগড়ি দিতেছিলেন, ও মধ্যে মধ্যে মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিতে ছিলেন। প্রেতমূর্ত্তি মার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ধীরে ধীরে বলিল "মা, কেন বৃথা শোক করিতেছ? এই দেখ আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি।"

বৃদ্ধা হঠাৎ পুত্রের ছায়া মূর্ত্তি নিজের পার্শ্বে উপস্থিত দেখিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তাহার পর জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। প্রেত মনে করিয়াছিল তাহার মা তাহার মৃত্যুর পর আবার তাহাকে দেখিতে পাইলে যেন স্বর্গ ফিরিয়া পাইবেন, কিন্তু ঘটনার অন্য প্রকার পরিণতি দেখিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বুঝিল যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়েরা শোক প্রকাশ করে বটে, কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তি আবার ফিরিয়া আসিলে প্রায় কেহই সন্তুষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বর্গ ও নরক

সভ্য ও অসভ্য জগতের সর্ব্বত্র আমরা 'স্বর্গ' ও 'নরকের' কল্পনা দেখিতে পাই। কথিত হয় যে, এই জড়জীবনে যে কখনও কোনও অন্যায় বা পাপ করে নাই তাহার মৃত্যুর পর দেবদূতেরা আসিয়া তাহার সুক্ষ্ম দেহকে সোজা স্বর্গে লইয়া যায় এবং তথায় তাহার জন্য নানাপ্রকার সুখভোগের আয়োজন থাকে। কিন্তু যে ইহলোকে নানাপ্রকার পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার মৃত্যুর পর ভীষণাকার যমদূতেরা তাহার জীবাত্মাকে সোজা নরকে লইয়া যায় এবং তথায় তাহাকে অতি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে এই সকল নরকের যে প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে অতিশয় সাহসী লোকেরও মনে ভীষণ আতঙ্কের উদয় হয়।

কিন্তু এই স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা তাহা আমরা 'ইহলোক ও পরলোক' পুস্তকে পুনঃ পুনঃ বিবৃত করিয়াছি। আমাদের Seance এ (প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিবার চক্র) উপস্থিত সমস্ত প্রেতাত্মাই একবাক্যে প্রকাশ করিয়াছে যে প্রেতলোকে নরকের অস্তিত্ব নিছক কল্পনা। মৃত্যুর পর কোনও আত্মাকেই নরক নামক কোনও স্থানে লইয়া যাওয়া হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে নরক যদি কল্পনা হয়, তাহা হইলে এই মরজগত ভগবানের সৃষ্ট হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে অন্যায় কার্য্যের ফল পাইবার জন্য নিশ্চয়ই ওপারে নরকের ব্যবস্থা থাকিত। ন্যায় ও অন্যায় কাজের যদি প্রভেদ না থাকিল তবে ভগবান থাকা না থাকা সমান। আপত্তি যে যুক্তিসঙ্গত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে প্রেতলোকে নরকের কথা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাটা বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য আমি আমার 'ইহলোক ও পরলোক' পুস্তক হইতে এক প্রেতাত্মার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"এ পারে (পরলোকে) নরক বলিয়া কোনও বিশেষ স্থান নাই। তোমাদের ওপারে (আমাদের জগতে) এ-পারের নরকের যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অলীক। তবে নরক যন্ত্রণা যে এ পারেও আছে তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। নানাপ্রকার অন্যায় কাজ করিয়া যাহাদের আত্মা কলুষিত হইয়াছে, তাহাদের মনে ঐ সকল কাজের চিন্তা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের মৃত্যুর পর এপারে তাহারা যে কষ্ট পায় তাহা কাল্পনিক নরক যন্ত্রণা হইতে কোনও অংশে কম নয়। যেখানে তাহারা কোনও গুরুতর পাপ কাজের (তাহাদের হিসাব অনুসারে) অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই সেই স্থানে তাহারা সর্ব্বদা ঘুরিয়া ফিরিয়া

বেড়ায় এবং প্রায়ই ঐ সকল কাজের পুনরাভিনয় দেখিতে পায়। যে নরহত্যা করিয়াছে, সে দেখে, সে ঐ নরহত্যা পুনরায় ঠিক সেইভাবেই করিতেছে। অবশ্য এপারে আসিয়া তাহার মনে যদি কৃত কর্ম্মের জন্য প্রকৃত অনুতাপ হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই মানসিক নরক যন্ত্রণার হ্রাস হয়।” (ইহলোক ও পরলোক ঃ ১৮৯ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত মানসিক নরক যন্ত্রণা ছাড়া আর এক প্রকারের অল্লাধিক যন্ত্রণা ওপারে প্রায় সকলকেই ভোগ ক ে হয়। আমরা প্রায়ই দেখি এই মরজগতে আমরা একাধিক বাসনার দাস হইয়া থাকি। অনেকে আজীবন ধূমপান, অহিফেন, গাঁজা, চরস, মদ্য ইত্যাদির নিয়মিত দাস থাকে। ঐ সকল নেশার অভাব তাহারা আদৌ সহ্য করিতে পারে না। বেশ্যাসক্তি অনেকের আজীবনের সাথি হইয়া থাকে। অনেকে বিনা কারণে লোকের সহিত কলহ করা, প্রতিবাসীর অনিষ্ট করা প্রভৃতি অভ্যাস মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারে না। এই সকল কু-অভ্যাস ও বাসনা এপারে দমন না হইলে, উহারা আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওপারে যায় ও তাহার জন্য আমাদিগকে প্রেতলোকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ওপারে আমাদের জড়দেহ না থাকাতে, ঐ সকল কু-অভ্যাস ও বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। ওপারে মদ্যপের বা বেশ্যাসক্তের মদ্যপানের বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে; কিন্তু তাহা

পরিতৃপ্তি করিবার কোন উপায় ওপারে নাই। এ অবস্থায় প্রেতাত্মার কি পরিমাণ যন্ত্রণা হইবার সম্ভাবনা তাহা অনুমান করা বোধ হয় খুব কঠিন কাজ নয়। প্রেতাত্মারা কিন্তু আমাদিগকে বারবার বলিয়াছে এই সকল অতৃপ্ত বাসনা ওপারে শীঘ্রই ক্ষয় পায়। যাহারা এই সকল বাসনার দাস তাহারা হয়ত আমাদের এই কথায় যথেষ্ট সান্ত্বনা পাইবে।

এইবার আমরা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব। মরজগতে কি কি প্রকারের লোক পরলোকে কি কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। পাঠক মনে রাখিবেন যে আমরা এ স্থানে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা সমস্তই প্রেতাত্মার বিবৃতি। এই বর্ণনা যে সত্য তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রেতের বৈঠকে (Seance) ভিন্ন ভিন্ন প্রেতের নিকট আমরা প্রায় একই বর্ণনা পাইয়াছি!

মানুষের নিম্নস্তরে এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের জীবন ধারণ প্রণালী পশুপক্ষী হইতে বিশেষ পৃথক নয়। ইহারা আহার, শয়ন এবং সন্তান উৎপাদন ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। নিজের সুখের জন্য ইহারা না পারে এমন কাজ নাই। তাহারা কতকটা সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করে বটে; কিন্তু অপরের প্রতি তাহাদের যে একটা কর্ত্তব্য আছে, ইহা তাহারা কোনও দিন ভাবে না। পৃথিবীতে এমন

অনেক (অসভ্য) জাতি আছে যাহারা প্রয়োজন হইলে নিজের স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, এমন কি বৃদ্ধ পিতামাতাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে। ইহা যে অন্যায় তাহা তাহারা আদৌ স্বীকার করে না। সময় সময় এই শ্রেণীর লোক প্রতিবাসীকে সপরিবারে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। এই ধরণের লোক মৃত্যুর পর ওপারে যাইয়া দেখে যে সেখানকার সবই এখান হইতে বিভিন্ন। ইহারা যখন দেখে, যে সকল কাজ করিয়া তাহারা এপারে আজীবন কাটাইয়াছে, সে সকল ওপারে একেবারে অচল, তখন তাহারা এই মরজগতকে আকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করে। যখন বুঝিতে পারে যে উহা অসম্ভব, তখন আবার এপারে ফিরিয়া আসিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা অনেকে প্রায়ই মৃত্যুর পর বুঝিতে পারে না যে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা মনে করে তাহারা এখনও এপারে রহিয়াছে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। যখন দেখে তাহা অসম্ভব, তখন তাহারা ব্যাকুলভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সুযোগ পাইলেই এপারের কাহারও জড়দেহকে আশ্রয় করে। ইহাকেই আমরা 'ভূতে পাওয়া' বলি। এই জাতীয় অজ্ঞ লোকদের মধ্যে মৃত্যুর পর অনেকে উপরোক্ত প্রকার লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাদের মধ্যে ভূতে পাওয়ার সংখ্যা অনেক অধিক হয়।

২। এই মরজগতের অধিকাংশ লোকই ভাল মন্দ মিশ্রিত। ইহারা প্রায়ই নিতান্ত সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারা অন্যায় কাজ করে না—তবে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সুযোগ পাইলে যে না করে তাহাও বলা যায় না। মৃত্যু কি, পরলোক কাহাকে বলে, মৃত্যুর পর আমাদের কি হইবে প্রভৃতি বিষয়ের কোনও প্রকার আলোচনা তাহারা করে না। পৃথিবীর সভ্য সমাজের অধিকাংশ লোকই এই ভাবের। ইহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই অনেক সময় ইহাদের অবস্থা উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর লোকের মত হয়। ইহলোকে ইহারা পরলোক সম্বন্ধে প্রায়ই কোনও প্রকার চর্চ্চা করে না। অনেকে নিয়মিত ভাবে তোতাপাখীর রাম রাম উচ্চারণের ন্যায় গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করে, কিন্তু মৃত্যুর পর কি হইবে সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা বা অনুসন্ধান করে না। তাহাদের মধ্যে অনেকে জানে যে যাহারা সর্ব্বদা পূজা পাঠ লইয়া থাকে তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে চলিয়া যাইবে, আর আর সকলে সোজা নরকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে।* মৃত্যুর পর তাহারা যখন দেখে যে ওপারের ব্যাপার

* সাধারণের বিশ্বাস, যে নিত্য নিয়মিতভাবে পূজা ও পাঠ করিয়া থাকে মৃত্যুর পর সে সোজা স্বর্গে গমন করে। হয়ত সে শত শত মিথ্যা কথা বলে, প্রয়োজন হইলে প্রতিবাসীর অনিষ্ট করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। ছয়টী রিপুর মধ্যে প্রথম তিনটি দমনের জন্য সে কোন দিনই চেষ্টা করে নাই। তথাপি যদি সে নিত্য পূজা ও পাঠ করে তাহা হইলেই লোকে তাহাকে বিশেষ পুণ্যাত্মা মনে করে এবং সাধারণের ধারণা যে তাহার মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে, যদি কেহ সত্যবাদী হয়, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যাহার আয়ত্বের মধ্যে এবং যে অপরের উপকার

সম্পূর্ণ অন্য ধরণের, তখন স্বভাবতঃই তাহারা দিশেহারা হইয়া পড়ে। কিন্তু এপারের লোকদিগকে ওপারে সাহায্য করিবার জন্য লোকের অভাব হয় না। এই পরামর্শদাতাদিগের শিক্ষার গুণে দিশেহারা প্রেতাত্মাদের অনেকে ঠিক রাস্তা চিনিতে পারে। কিন্তু যাহারা ঐ সকল উপদেষ্টার কথা গ্রাহ্য করে না, তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রেতলোক ও মরজগতের মধ্যে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশেষে প্রকৃত পথের সন্ধান পায়। আবার কেহ কেহ বহুদিন অনির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া পুনরায় কোনও মরজগতে জন্মগ্রহণ করে।

৩। আমাদের এই জগতে কতকগুলি এমন লোক আছেন, যাঁহাদিগকে আমরা 'মুক্ত জীব' নামে অভিহিত

করিতে না পারুক অনিষ্ট করে না, সে যদি পূজা ও পাঠ না করে তাহা হইলে লোকে তাহাকে নাস্তিক মনে করে এবং সাধারণের ধারণা সে মৃত্যুর পর অতি ভীষণ নরকে গমন করে।

প্রেতাত্মাদিগের বিবৃতি কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা বলে,—পূজা পাঠ কেহ না করিলেও পরপারে তাহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হয় না। মনটাই আসল জিনিস। তুমি হয়ত জীবনে একদিনও পূজা কর নাই বা কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর নাই, এমন কি কোনও দেবদেবী পর্য্যন্ত মানিতে না। কিন্তু তুমি যদি কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে অতি সাধারণভাবেও বশীভূত করিয়া থাক তাহা হইলে মৃত্যুর পর ওপারে তোমার কোনও কষ্ট বা যাতনা হইবে না। প্রেতলোকে কিছুদিন থাকিবার পর তুমি স্বর্গে গমন করিবে। কিন্তু তুমি যদি নিত্য পূজা পাঠ কর অথচ ইন্দ্রিয় বা বাসনা দমন করিতে না পার, তোমাকে পরপারে বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কেবল মাত্র পূজা পাঠ তোমাকে ঐ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আসল কথা মনটা যার নির্ম্মল, যে ইন্দ্রিয় ও বাসনা দমন করিয়াছে, মৃত্যুর পর সে ছাড়া আর কেহই স্বর্গলাভ করিতে পারিবে না।

করিতে পারি। ইহাঁরা মৃত্যুর পূর্ব্বে সকল প্রকার বাসনা ও রিপুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, এইজন্য ইহাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রেতলোক অতিক্রম করিয়া উচ্চতর লোকে গমন করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পওহারী বাবা, বাবা গম্ভীরনাথ প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। অবশ্য আমাদের জগতে এ প্রকার মুক্তজীবের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

এই স্থানে প্রেতলোক কি সে সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে (মুক্তজীব ছাড়া) সমস্ত প্রেতাত্মাকে যেখানে যাইতে হয়, তাহাই প্রেতলোক নামে প্রসিদ্ধ। মৃত্যুর পর জীবাত্মার মধ্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনার সামান্যমাত্র প্রভাবও বর্ত্তমান থাকে ততদিন তাহাকে এই লোকে থাকিতে হয়। ইহাকে আমরা 'শোধনাগার' (Purgatory) নামে অভিহিত করিতে পারি! এই লোকে যে সকল আত্মার মনের গ্লানি দূর হইয়া যায়, তাহারা যথা সময়ে উচ্চতর লোকে চলিয়া যায়। কিন্তু যাহাদের তাহা হয় না, তাহারা নির্দ্দিষ্ট কাল প্রেতলোকে থাকিবার পর জড়জগতে ফিরিয়া আসে। আমরা অনেক প্রেতাত্মার নিকট শুনিয়াছি যে প্রেতলোকে অনেক সময় এমন রাক্ষস প্রকৃতির জীবাত্মার আবির্ভাব হয়, যাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট কালের পর আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকে জড়দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে মানুষের মস্তকের দিক হইতে একটি সূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠিত হইতে থাকে। ইহা অবিকল ঐ মৃত লোক গমনোন্মুখ মানুষের মত। যতক্ষণ পর্যান্ত না মানুষের জড়-দেহের মৃত্যু হয় এই মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হয় না। মৃত্যুর ঠিক পরে এই নবীন সূক্ষ্ম মূর্ত্তির অবস্থা সর্ব্বত্র এক প্রকার হয় না। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যে কয়েকটি অবস্থা বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় আমরা ঐগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। এই সব কাহিনী আমরা যে শুধু প্রেতাত্মাদিগের নিকট শুনিয়াছি তাহা নয়। মহামান্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কাশীর প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামী, গোরক্ষপুরের বাবা গম্ভীর নাথ প্রভৃতির নিকটও আমরা ঠিক ঐ ভাবের কথা শুনিয়াছি। পাঠক মনে রাখিবেন এ স্থানে আমরা যে সকল মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিলাম, তাঁহারা সকলে সাধনা বলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ সকল কথা যে আমরা অসঙ্কোচে বিশ্বাস করিতে পারি তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

১। অনেক স্থানে দেখা যায় যে ঐ নব নির্ম্মিত সূক্ষ্ম

দেহ জড়দেহের মৃত্যুর পর প্রেতলোকে অজ্ঞান অচৈতন্য ভাবে অবস্থান করে—হঠাৎ দেখিলে মনে হয় উহা মৃত। কেহ কেহ অল্প সময়ের পরই চৈতন্য লাভ করে, আবার কেহ কেহ বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় অবস্থান করে। ঐ অচৈতন্য অবস্থায় ওপারের কেহই তাহাদের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করে না। এই সকল প্রেতাত্মার চৈতন্য হইলে প্রায়ই ইহারা বুঝিতে পারে না যে উহারা ইহলোক ছাড়িয়া প্রেতলোকে গিয়াছে। সেই জন্য জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা যে সকল আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া আসিয়াছে তাহাদের নিকট (সূক্ষ্ম দেহে) উপস্থিত হয় এবং নানা প্রকার উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে তাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই।

২। মৃত্যুর পর অনেক আত্মা অজ্ঞান অচৈতন্য হয় না বটে, কিন্তু এইভাবে অকস্মাৎ জড়দেহহারা হইয়া তাহারা ঠিক বুঝিতে পারে না যে তাহাদের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইল। (১) ঐহিক জগতে ইহারা মৃত্যু, পরলোক, সূক্ষ্মদেহ প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও প্রকার শিক্ষা পায় নাই বা আলোচনা করে নাই। ইহলোকে তাহারা যে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আজীবন অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাদের বর্ণনা ও

১। ইহাদের জড়দেহ থাকে না বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ থাকে ; নিজের সূক্ষ্মচক্ষু দ্বারা ঐ সূক্ষ্ম দেহ দেখে বলিয়া তাহারা প্রথমে বুঝিতে পারে না যে, তাহাদের জড়দেহ নাই। মৃত্যুর পর সব প্রেতাত্মারই অবশ্য এই ভ্রম হয় না।

প্রকৃত ব্যাপারের সহিত বিষম পার্থক্য দেখিয়া তাহারা মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ ভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে ও সময়ে সময়ে বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবে অবস্থান করে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ওপারের কোনও কোনও প্রেতাত্মা ঐ নবাগত প্রেতাত্মাদিগকে তাহাদের অবস্থা বুঝাইয়া দেয়। তবে ওপারের প্রেতাত্মারা কোনও কোনও নবাগত সূক্ষ্মদেহীকে সাহায্য করে ও আর আর সকলকে কেন সাহায্য করে না তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। এই সাহায্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেওয়া হয় কিম্বা কাহার আদেশে দেওয়া হয় তাহাও জানি না।

৩, যাঁহারা এ জগতে মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর আত্মার কি অবস্থা হয় প্রভৃতি সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছেন এবং মনকে যথাসাধ্য কাবুর মধ্যে রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে পথ অবলম্বন করিলে প্রেতলোক হইতে উন্নততর লোকে যাওয়া যায়, এই শ্রেণীর আত্মারা ওপারে যাইয়াই তাহা অনুসরণ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রেতলোকে প্রবেশ করিয়াই উচ্চতর লোকে প্রস্থান করে। কাহার আদেশে ইহা করা হয় ইহা প্রেতলোকবাসীরা বলিতে পারে না।

আমাদের মধ্যে মৃত্যুর অনধিক এক বৎসর পর্য্যন্ত মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করা হয়। যে যে প্রেতাত্মার

সহিত আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে তাহারা সকলেই এই প্রথা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছে। তাহারা বলে, "সচরাচর যাহারা ওপারে যায় (যাহাদের মৃত্যু হয়), তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ইন্দ্রিয়াদির দমন হয় না এবং অনেক আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। নিয়মিতভাবে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে মৃতের ইন্দ্রিয়াদি ক্রমে ক্রমে শান্ত হইতে থাকে।" কিন্তু Seance-তে আগত সমস্ত প্রেতাত্মাই এ বিষয়ে একমত যে শ্রাদ্ধাদি মৃতের অপরিতৃপ্ত বাসনার দমনে ফলদায়ক হয় না। ইহার জন্য যাহা করিতে হয় তাহা মৃতের আত্মাকে প্রেতলোকে নিজেকে করিতে হয়। এ বিষয়ে পুরাতন প্রেতাত্মারা নবাগত প্রেতাত্মাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারে না।

পিণ্ডদান (বিশেষতঃ গয়ায়) দ্বারা মৃতের আত্মার কোনও উপকার হয় কি না, আমরা কয়েক জন প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে দেখিলাম তাহাদের সকলের একমত। তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—"অনেকে মনে করে, 'প্রেতাত্মার মন মরজগতে যতই কলুষিত হইয়া থাকুক, একবার গয়ায় পিণ্ড দিলেই সে একেবারে নিষ্পাপ আত্মায় পরিবর্ত্তিত হয় এবং পিণ্ডের পর উচ্চতর লোকে চলিয়া যায়।' এ বিশ্বাসের কোনও মূল্য নাই। পিণ্ড দ্বারা প্রেতাত্মার মনের ময়লা দূর হইতে পারে না। কেবল মাত্র এক অবস্থায় আমরা গয়ায় পিণ্ডদানের

সুফল দেখিয়াছি। যে সকল প্রেতাত্মা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে পিণ্ডদানে মুক্তিলাভ হয়, তাহারা যদি লৌকিক জগতের কাহারও উপর ভর করে এবং তাহাদের উদ্দেশে যদি পিণ্ডদান করা হয়, তাহা হইলে অনেক সময় ঐ সকল প্রেতাত্মা 'ভূতে পাওয়া' জড়দেহকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আবার কোনও কোনও স্থানে এমন দুষ্ট প্রেতাত্মা দেখিয়াছি যাহারা পিণ্ডদানের পরও যাইতে চায় না। আমাদের উপদেশ এই যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে পিণ্ডদান করিয়া পরীক্ষা করা ভাল। হয়ত এই উপায়ে প্রেতাত্মা ছাড়িয়া যাইতে পারে"।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেতাত্মার ইহলোকে ফিরিয়া আসা।

যে যে অবস্থায় প্রেতাত্মা পরলোক হইতে আমাদের মরজগতে আবার ফিরিয়া আসে, তাহা আমরা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম।

১। Seance বা প্রেত আহ্বানের চক্রে Medium বা সহায়কের সাহায্যে প্রেতাত্মাকে ফিরাইয়া আনা যায়। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি এমন কাহিনী আমার "ইহলোক ও পরলোক" পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে যাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে এই প্রকার চক্র প্রায়ই বসান হয় এবং তথায় প্রেতাত্মারা উপস্থিত হইয়া পরলোক সম্বন্ধে নানা প্রকার নূতন নূতন সংবাদ প্রদান করিয়া থাকে।

এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে এই সকল চক্রে প্রায়ই এমন প্রেতাত্মা সকল উপস্থিত হয়, যাহাদিগকে আদৌ আহ্বান করা হয় নাই, এমন কি ঐ চক্রে উপস্থিত দর্শকদিগের মধ্যে সে সকল প্রেতাত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ অবগত ছিল না। অর্থচ যে সকল প্রেতাত্মাকে আহ্বান করা হয় তাহারা প্রায়ই উপস্থিত হয় না। যাঁহারা এই

চক্র সম্বন্ধে বিশদ সংবাদ জানিতে চাহেন, তাঁহারা "ইহ-লোক ও পরলোক" পুস্তক পাঠ করিলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

২। যে সকল লোক মৃত্যুর পর ইহলোকের ও তাহাদের আত্মীয়দিগের মায়া কোনও মতে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা প্রতিনিয়ত তাহাদের আত্মীয়দিগের আসে-পাশে ঘুরিতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদের মধ্যে কাহারও জড়দেহে প্রবেশ করে। এই ভাবের 'ভূতে পাওয়া' লোককে কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন। যাহারা ভূত বিশ্বাস করে না, তাহারা মনে করে, ঐ ভূতাবিষ্ট লোকের এমন কোনও পীড়া হইয়াছে যাহা ঠিক ধরা যাইতেছে না। তাহাদের লৌকিক চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হয় না, কিন্তু বলা বাহুল্য তাহাতে বিন্দুমাত্র ফল হয় না। আমি নিজে এই প্রকারের কয়েকটি রোগী দেখিয়াছি। প্রথমে তাহাদের ঐ নূতন ধরণের পীড়াকে এপিপ্লেক্সি, হিস্‌টিরিয়া প্রভৃতি মনে করিয়া নানা প্রকার ঔষধাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে যখন কোনও ফল পাওয়া গেল না, তখন লেখকের পরামর্শ অনুসারে দুই একটি অতি সামান্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হয়। বলা বাহুল্য তাহাতেই তাহাদের পীড়ার সম্পূর্ণ উপশম হয়।

যাঁহারা এই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন প্রায়ই কোমল প্রকৃতির স্ত্রীলোকেরই এই

'ভূতের পীড়া' হইয়া থাকে। প্রেতাত্মারা যে অতি অল্প আয়াসে ইহাদের জড়দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে তাহা আমরা বহুতর স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাঁহাদের চক্র (Seance) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন, চক্রের সহায়কেরা (Medium) প্রায়ই নম্র স্বভাবের স্ত্রীলোক হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে প্রেতাত্মারা এই প্রকারের স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে অতি অল্প চেষ্টায় শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

৩। ইহলোকে যদি কেহ হত্যা প্রভৃতি কোনও ভীষণ কাজ করিয়া থাকে, দেখা যায় যে তাহার মৃত্যুর পর তাহার প্রেতাত্মা ঐ হত্যার স্থানে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। আত্ম-হত্যাকারীর প্রেতাত্মাও এইভাবে আত্মহত্যার স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে রাত্রিকালে ঐ সকল স্থানে বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। যাঁহারা এ সকল মানেন না, তাঁহারা মনে করেন ঐ সকল মূর্ত্তি দর্শকের মনের বিকার মাত্র। কোনও কোনও স্থানে ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানেই যে লোকে ঐ প্রকার মূর্ত্তি সত্য সত্যই দেখিয়া থাকেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

৪। অনেক সময় প্রেতাত্মারা বিশেষ একটা কারণের বশীভূত হইয়া ইহলোকে উপস্থিত হয় এবং ব্যক্তি বিশেষকে দেখা দিয়া থাকে। মনে কর এক জনকে এমন গোপনে হত্যা করা হইয়াছে যে, অনেক চেষ্টাতেও হত্যাকারী ধরা

পড়িল না। হত ব্যক্তির প্রেতাত্মা কোনও কারণ বশতঃ হয়ত বিশেষভাবে প্রতিহিংসা পরায়ণ। সে নানা প্রকার উপায়ে চেষ্টা করে যাহাতে হত্যাকারী ধৃত হয়। এমন কি অনেক সময় সে জড়দেহ ধারণ করিয়া যাহাতে হত্যাকারী সাজা পায় তাহার চেষ্টা করে। পৃথিবীর বহুতর স্থান হইতে এ প্রকারের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। লেখকের সম্মুখে ঠিক এই ধরণের যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

৫। অনেক সময় দেখা যায় যে নরনারীর মধ্যে গভীর ভালবাসা থাকিলে এবং উহাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে উহার প্রেতাত্মা অপরের সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করে। এই জাতীয় এলাহাবাদের একটি ঘটনা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক এই ধরণের আরও কয়েকটি ঘটনার কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যেখানে যেখানে প্রেতাত্মার সহিত জড়দেহীর মিলন হইয়াছে, সেই-খানেই দেখা যায় যে জড়দেহীকে অল্পদিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই জন্য মনে হয় যে জড়দেহের সহিত সূক্ষ্মাত্মার মিলনের পরিণাম কখনই ভাল হয় না।

৬। আমাদের দেশে পিশাচ সিদ্ধ, যোগিনী সিদ্ধ প্রভৃতি তান্ত্রিকদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ ভাবে যাহারা সিদ্ধ হইয়াছে তাহারা নাকি ও পারের প্রেতাত্মাদিগকে মন্ত্র দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা নানা প্রকার কঠিন ও

অমানুষিক কাজ করাইয়া লয়। লেখকের এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা না থাকাতে এ বিষয়ে কোনও প্রকার মতামত দিতে পারিলেন না। তবে ইহা যে একেবারে অসম্ভব ইহাও মনে হয় না। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের প্রথমেই বর্ম্মার যে সকল কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা অনেকটা এই ধরণের। ঐ সকল ঘটনা লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। উহার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র ছলনা চাতুরী নাই তাহা লেখক মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন। ফুঙ্গিদের (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) কোনও অলৌকিক ক্ষমতা না থাকিলে তাঁহারা ঐ ভাবের কাজ কখনই করিতে পারিতেন না। উহাঁরা লেখককে বলিয়াছিলেন যে প্রেতাত্মারা তাঁহাদের বশীভূত। বর্ম্মায় যদি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রেতাত্মাকে বশীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশে উহা অসম্ভব হইবে কেন? লেখকের বয়স যখন তের চৌদ্দ বৎসর তখন তিনি চট্টগ্রামের এক পল্লীতে এই ধরণের একটি ঘটনা দেখিয়াছিলেন। একজন নীচ জাতীয় লোক একদিন সন্ধ্যার পর একটা আটচালার মধ্যে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন লোকের সম্মুখে কতকগুলি এমন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। লোকটা বলিয়াছিল যে সে "ব্রহ্ম রাক্ষস সিদ্ধ"। লেখকের বয়স তখন অল্প। লোকটা যাহা দেখাইয়াছিল তাহার মধ্যে যে কোনও প্রকার চাতুরী ছিল না তাহা তিনি

বলিতে পারেন না। এই জন্য ঐ ঘটনা এই পুস্তকে বিবৃত হয় নাই।

৭। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রেতাত্মারা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে নিদ্রিতাবস্থায় আসিয়া দর্শন দেয় এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্য উপদেশাদি দিয়া থাকে। এই প্রকার স্বপ্নাদেশের কথা আমরা সভ্য অসভ্য উভয় সমাজেই প্রায় শুনিয়া থাকি। আমাদের দেশে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কোনও কোনও দেবতার স্থানে 'হত্যা' দিবার কথা প্রায়ই শুনা যাইত। দেশের লোকের মনোভাব এ বিষয়ে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে আজকাল এ ধরণের ঘটনা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই। তারকনাথে এখনও পর্য্যন্ত অনেকে হত্যা দিয়া থাকে। যাঁহারা এই সব কথা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তারকনাথে কিছু দিন অবস্থান করিয়া এই সকল ঘটনার নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন অনেক কথা জানিতে পারেন যাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্ব মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। দেবতার স্থানে হত্যা দিয়া অনেকে যে সম্পূর্ণ সুফল লাভ করিয়াছেন, ইহা আমরা বেশ ভাল করিয়াই জ্ঞাত আছি। এ বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা এই পুস্তকের যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস এই প্রকারের হত্যা দ্বারা লোকে

যে সুফল লাভ করে তাহা দেবতার অনুগ্রহ নয়—তাহা পরলোকবাসী প্রেতাত্মাদের কাজ। এই সকল সাধু প্রকৃতির প্রেতাত্মারা দুস্থ ব্যক্তির কাতর প্রার্থনায় আকৃষ্ট হইয়া সাধ্যমত উপকার করে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে ওপারের অনেকে এপারের লোকদিগের দুঃখ ও অভাব দূর করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকে। আমরা বিশেষ বিশ্বাস-যোগ্য প্রেতাত্মার নিকট শুনিয়াছি যে সেকালে (যখন লোক বিশেষভাবে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ছিল) ওপারের অনেকে জড়দেহে আমাদের মরজগতে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া এখানকার অনেককে নানাপ্রকার উপায়ে সাহায্য করিতেন।' তখন ইহাঁরাই 'মহর্ষি', 'দেবর্ষি', 'দেবতা' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। এখন অবশ্য ঐ সব কথা "ঠাকুরমার কাহিনী" বলিয়া পরিচিত।

প্রায় ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে আমার এক কাকা এক দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হ'ন। তখন আমার পিতামহ জীবিত। তিনি বিশেষভাবে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন চিকিৎকেরা বলিয়া গেলেন যে রোগ তাঁহাদের সাধ্যাতীত, তখন পিতামহ বাড়ীর 'বার মেসে' কালীদেবীর দালানে হত্যা দিলেন। হত্যা দিবার পূর্ব্বে তিনি বেশ উচ্চৈঃস্বরে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! ছেলে যদি ভাল না হয়, আমি তোর মন্দির ছাড়িয়া উঠিব না। যদি ছেলে ভাল না হয়, বুঝিব লোকে বৃথায় তোর পূজা করে।" রাত্রি প্রায় তিনটার

পর তিনি হত্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন (অনেক আত্মীয় স্বজন ঐ দালানে অপেক্ষা করিতেছিলেন), "মা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলাম যেন বাবা (এই ঘটনার প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল) আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং যাহা করিতে হইবে বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলেন।" বল্য বাহুল্য স্বপ্নাদিষ্টভাবে চিকিৎসা করায় কাকা সেই ভীষণ পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিলেন।

এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রেতাত্মারা যদি এই ভাবে যাওয়া আসা করিতে পারে, তাহা হইলে আহ্বান মাত্রেই আসে না কেন? অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই একজন লোক তাহার কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকে অধীর হইরা পুনঃ পুনঃ তাহাকে আহ্বান করিতেছে কিন্তু মৃতের আত্মা উহাতে কর্ণপাত করে বলিয়া ত মনে হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে প্রিয়জনের মৃত্যুর পর সর্ব্বত্রেই আমরা তাহাদের আত্মাকে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সকলেই জানেন ইহা হয় না। অথচ আমরা উপরে বলিয়াছি যে অনেক সময় প্রেতাত্মা আবার ইহলোকে ফিরিয়া আসে। এ প্রকার অসঙ্গতির কারণ কি?

পাঠক মনে রাখিবেন যে মৃত্যুর পর প্রেতাত্মারা ইচ্ছা করিলেই এপারে ফিরিয়া আসিতে পারে না। এপারে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিশেষভাবে সাধনা করিতে হয়।

অবশ্য অনেকে সামান্য সাধনার পরই এ ক্ষমতা লাভ করে, আবার অনেকে বহুদিন ব্যাপী সাধনার পরও উহা লাভ করে না। এ পার্থক্য যে কেন হয় তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। পাঠক মনে রাখিবেন এই প্রকারের পার্থক্য আমরা এপারে অনেক বিষয়ে সচরাচর দেখিতে পাই। ধরুন সঙ্গীত-বিদ্যার কথা। অনেকে বহুদিন ব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়াও এই বিদ্যায় অতি সামান্য মাত্র দক্ষতাও লাভ করে না। আবার কেহ কেহ অতি অল্প দিনেই ইহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। মৃত্যুর পর ফিরিয়া আসার ক্ষমতা সম্বন্ধেও এই প্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেতের বৈঠকে (Seance) সচরাচর দেখা যায় যে বহুতর প্রেতাত্মা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর কেহই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বা আমাদের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে পারে না। অনেক সময় এই দুই একজন প্রেতাত্মা ঐ বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য প্রেতাত্মার (যাহারা আমাদের নিকট আসিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই) সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। এ ক্ষেত্রে আমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে ঐ অদৃশ্য প্রেতাত্মা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে না কেন? উত্তর পাইয়াছি "উহারা ও-পারে ফিরিবার ক্ষমতা পায় নাই"। এই ক্ষমতার মধ্যেও অনেক সময় পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রেতাত্মা শুধু 'ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া আমাদের সহিত আলাপ পরিচয়

করে। অনেকে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। আবার কেহ কেহ জড়দেহ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জড়দেহের ক্রমোন্নতিবাদ (Evolution Theory)

আজ-কালকার বিজ্ঞান জগতে ডারউইনের (Darwin) ক্রমোন্নতিবাদ সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তাহা পৃথিবীর সকলেই স্বীকার করেন। নীচে আমরা অতি সংক্ষেপে এই মতটা বিবৃত করিতেছি।

প্রথমে যখন এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়, তখন ইহা অতিশয় উত্তপ্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে যখন ইহা শীতল হইয়া আসিল, তখন বহু শত বৎসর ব্যাপী বৃষ্টি হওয়াতে সমগ্র ধরণী জলে ভরিয়া গেল। এই জল হইতে ক্রমে ক্রমে জলজ উদ্ভিদ এবং পরে উহা হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের সৃষ্টি হইল। বহু লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর প্রকৃতির ক্রমোন্নতি নিয়ম অনুসারে ঐ সকল কীট পতঙ্গ হইতে নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের পর বানর এবং অবশেষে ঐ বানর হইতে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইল।

আমরা উপরে যাহা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা যে সত্য ইহা আজ-কাল ছোট বড় সমস্ত বিজ্ঞানবিদই স্বীকার করেন। রামচন্দ্রের অনুচরেরা যে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহ ,ইহা অপ্রিয় মনে হইলেও আমাদিগকে নিতান্ত বাধ্য হইয়া মানিতে

হইতেছে। যে সকল ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ বিশেষ ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণের বিনা সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা যদি সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারে, তাহা হইলে বানর আমাদের পূর্ব্ব পিতামহ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

এই ক্রমোন্নতিবাদের মধ্যে কিন্তু একটা প্রকাণ্ড ফাঁক (Missing link) রহিয়া গিয়াছে। এই ফাঁকটা যদি কোনও প্রকারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দূর করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অতি প্রাচীন ভগবানকে কেহ মানিবার কোনও আবশ্যকতা অনুভব করিত না। তাহা হইলে লোকে বলিত সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ঐ ফাঁকটা বিষম গোলের সৃষ্টি করিল। ব্যাপারটা এই।

সর্ব্ব প্রথম যখন এই জগতে প্রাণীর আবির্ভাব হইল, তখন উহা কোথা হইতে আসিল ? ডারউইন (Darwin) ও তাঁহার সমসাময়িক সমস্ত বৈজ্ঞানিক ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, উদ্ভিদ জলের মধ্যে পচিয়া যাইলে, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গ স্বতঃই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐ প্রকারের উদ্ভিদ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গে পরিণত হয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হক্সলে সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, পৃথিবীর সৃষ্টির প্রাক্কালে যদি পচা উদ্ভিদ হইতে কীট পতঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনও আমরা ঐ

প্রকারের উদ্ভিদ হইতে কীট পতঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারি। আপত্তিটা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া সকলকে ইহা মানিয়া লইতে হইল।

এইবার বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে দুইটি দলের আবির্ভাব হইল। একটী দল বলিল, পচা উদ্ভিদ হইতে প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এখনও হইতে পারে। দ্বিতীয় দলের নেতা হক্সলে। ইহাঁরা বলিলেন, প্রাণী হইতে প্রাণীর সৃষ্টি, পচা উদ্ভিদ হইতে প্রাণী উৎপন্ন হইতে পারে না। দুই পক্ষই নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা নিজের নিজের মত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন হক্সলে সাহেব পাশ্চাত্য জগতের ঐ সময়ের তাঁহার বিরুদ্ধবাদী বড় বড় বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিয়া সকলের সম্মুখে প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে পচা উদ্ভিদ হইতে কোনও প্রকারের প্রাণী উৎপন্ন হইতে পারে না।

তাঁহার এই নিমন্ত্রণ কেহই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হইলে হক্সলে নিম্নলিখিত প্রকার (Experiment) আরম্ভ করিলেন ঃ—

দুইটী বোতলের মধ্যে পচা উদ্ভিদ রাখিয়া উহাদের একটির মুখ তুলার দ্বারা বন্ধ করা হইল, অপরটির মুখ উন্মুক্ত হিল। তাহার পর দুইটি বোতলকে এ ভাবে উত্তপ্ত করা হইল, যাহাতে উহাদের ভিতরের সমস্ত কীটাণু মরিয়া যায়। তাহার পর দুইটি বোতলকে পরীক্ষা করা হইল—দেখা গেল,

যাহার মুখ বন্ধ ছিল তাহার মধ্যে কোনও প্রকার কীটাণু নাই; কিন্তু খোলা মুখ বোতলের মধ্যে অসংখ্য জীবাণুর আবির্ভাব হইয়াছে। ব্যাপার কি? তুলার স্বভাব এই যে ইহার ভিতর দিয়া বায়ু যাতায়াত করিতে পারে; কিন্তু ক্ষুদ্রতম কীটাণুও ইহার আবরণ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। দুইটি বোতলই উত্তপ্ত হওয়াতে, উহার ভিতরের সমস্ত কীটাণু মরিয়া গিয়াছিল। ইহার পর তুলার আবরণ থাকাতে একটির মধ্যে বাহির হইতে কোনও প্রকার জীবাণু যাইতে পারে নাই। যদি পচা উদ্ভিদে কীটাণু উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে দুইটি বোতলেই জীবাণুর আবির্ভাব হইত কারণ দুইটি বোতলেই পচা উদ্ভিদ রক্ষিত ছিল। তাহা যখন হয় নাই, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে পচা উদ্ভিদে জীবাণু উৎপন্ন হয় না।

উপরোক্ত পরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই হক্সলের মত (সৃষ্টির প্রাক্কালে পচা উদ্ভিদ হইতে প্রথম জীব সৃষ্ট হয় নাই) মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম জীব কোথা হইতে আসিল? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী যখন প্রথম সৃষ্ট হয়, তখন উহা আমাদের সূর্য্যের মত অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ অবস্থায় পৃথিবীতে কোনও প্রকার জীবাণু থাকা সম্ভব নয়। তবে জীবাণু আসিল কোথা হইতে? খুব সম্ভব, পৃথিবীর বাহির হইতে। অবশ্য কি প্রকারে ইহা বাহিরের কোনও

লোক হইতে এখানে আসিয়াছিল তাহা এখনও মানব জ্ঞানের অতীত।

কেহ কেহ বলেন, "পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চয়ই এই বিশ্বে এমন অনেক জগত ছিল যেখানে জীব জন্তু বাস করিত। ঐ সকল জগত হইতেই জীবাণু আমাদের জগতে উপস্থিত হইয়াছিল।" কিন্তু এ অনুমান বৈজ্ঞানিক নিয়ম বহির্ভূত। বিজ্ঞান বলে, আমাদের পৃথিবীর পঞ্চাশ ষাট মাইল ঊর্দ্ধে বায়ুর অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে অন্য জগত হইতে এখানে জীবাণু আসিতে পারে না। কারণ অন্য জগত হইতে জীবাণু বায়ুশূন্য আকাশপথে জীবিত অবস্থায় আমাদের জগতে পঁহুছিতে পারে না।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে, সমস্ত বিশ্বজগতে আকাশ (অর্থাৎ যে স্থানকে আমরা বায়ুস্থান মনে করি) ইথর নামক এক অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পরিপূর্ণ। এই ইথরের মধ্যে কোটী কোটী জীবাণু বাস করিতেছে। ইহারাই পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম জীবের সৃষ্টি করে। এই মতটা কতদূর প্রামাণিক তাহা জানা যায় না, কারণ এখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণের সাহায্যেও ইথরের মধ্যে এই জাতীয় জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

জীব সৃষ্টির একেবারে গোড়ায় প্রথম জীবাণু এই জগতে কি ভাবে উৎপন্ন হইল, এ প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে যত দিন পর্য্যন্ত না আবিষ্কৃত হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত

আমরা বলিতে বাধ্য যে ঐ জীবাণু ভগবান কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা ভগবানের নাম লইতে অসম্মত (অর্থাৎ নাস্তিকেরা) তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মহাশক্তির দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালিত হইতেছে, তাহারই ইঙ্গিতে কোনও অজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মানুসারে ঐ জীবাণু প্রথমে পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবাণু আমাদের জগতে কি ভাবে আসিল তাহার আংশিক বর্ণনা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের স্থিতি তেতাল্লিশ লক্ষ বৎসরেরও অধিক (৪৩.২০০০০)। এই সময়টাকে ব্রহ্মার দিবাভাগ বলা হয়, অর্থাৎ এই পরিমাণ সময় আমাদের জগত বিদ্যমান থাকে। তাহার পর ব্রহ্মার রাত্রিকাল অর্থাৎ সৃষ্টির লয় হয়। তখন সমস্ত জগত অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে এবং ঐ সময়কাল জগতের সমস্ত জীবাণু সকল মহাশূন্যে অচৈতন্য ভাবে অবস্থিতি করে। ইহার পর ব্রহ্মার নিশার শেষ হইলে সত্যযুগ উপস্থিত হয় এবং ব্রহ্মার ঐ অচৈতন্য জীবাণু হইতে সৃষ্টি কার্য্য নূতন ভাবে আরম্ভ হয়।

পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিকেরা যে ইথরের থিওরি প্রচার করেন, আমাদের সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত উহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (১)

জীব জন্তুর আত্মা

আমরা পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে পৃথিবীতে জড়দেহধারীর প্রথম সৃষ্টি হইতে একটা ক্রমোন্নতির ধারা অব্যবহিতভাবে চলিয়াছিল। যখন জড়জগতে এই ধারা চলিয়াছিল, তখন আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য জড়দেহ যে আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই আত্মার মধ্যেও একটা ক্রমোন্নতির ধারা নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল।

এই বিষয়ের বিচারের পূর্ব্বে একটি পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্বন্ধে দুই একটি কথার আলোচনা বিশেষ আবশ্যক মনে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জড়দেহের মধ্যে যাহা ঐ দেহের মৃত্যুর পরও বর্ত্তমান থাকে (অর্থাৎ যাহার নাশ বা মৃত্যু নাই) তাহাই আত্মা। কিন্তু এই আত্মা শুধু মানব দেহেই থাকে, না ইহা জগতের সমস্ত জীব জন্তুর মধ্যে বর্ত্তমান, এ বিষয়ে আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও প্রকার মতামত প্রকাশ করি নাই। এ বিষয়ে জনসাধারণের যাহাই মতামত হউক, আমরা কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, মানুষের মত পশু পক্ষীরও আত্মা আছে, অর্থাৎ

তাহাদের জড়দেহের নাশের পর এমন একটা জিনিস থাকিয়া যায় যাহা আমাদের আত্মার ন্যায় অমর। একটা কুকুরের (জড়দেহের) মৃত্যু হইল। উহার জড়দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে উহার এক ছায়াময় মূর্ত্তি উহার জড়দেহের ভিতর হইতে বাহির হইয়া প্রেতলোকে গমন করে। ইহাদের প্রেতলোক আমাদের প্রেতলোক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আমি ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে সকল Seance এ (প্রেত আহ্বান করিবার বৈঠক) উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে আমি কোনও জন্তু বা পক্ষীর প্রেত মূর্ত্তি দেখি নাই। ঐ সময় আমার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কোনও প্রকার চিন্তার উদয় হয় নাই, সেই জন্য আমি ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান বা আলোচনা করি নাই। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার পর আমার কয়েক জন বন্ধু ঐ সম্বন্ধে আমায় প্রশ্ন করেন। ঐ বিষয়ে আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না বলিয়া পত্রযোগে ইংলণ্ডে কনন্ ডয়লকে (Sir Conon Doyle) কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ আমি নিম্নে অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

"* * * "এইবার নিম্ন শ্রেণীর জীব জন্তু সম্বন্ধে প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তর দিতেছি। * * এ কথা সত্য যে আমি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রায় শতাধিক প্রেত-চক্রে (Seance) উপস্থিত হইয়াছি। তথায় আমি কখনও

কোনও জন্তু বা পক্ষীর প্রেত-মূর্ত্তি দেখি নাই। ইহা হইতে হয়ত আমার এই ধারণা হওয়া উচিত ছিল যে মানুষ ছাড়া আর সকলেরই জড়দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অস্তিত্বের অবসান হয়—অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে অমর কিছুই নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত দুইটি কারণ বশতঃ আমি ঐ ধারণা মানিয়া লইতে পারিলাম না।

১। "আপনি নিশ্চয়ই জানেন ক্রমোন্নতিবাদ (Evolution Theory) অনুসারে মানব নিম্ন শ্রেণীর জীব জন্তুর (বোধ হয়) সর্ব্বশেষ পরিণতি, অর্থাৎ, আমরা এই জীব জন্তু হইতেই ক্রমোন্নতি নিয়মানুসারে সর্ব্বশেষে উৎপন্ন হইয়াছি। আমাদের মধ্যে যে অমর আত্মা আছে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহা হইলে জীব জন্তুর মধ্যেও উহা নিশ্চয়ই আছে। আমাদের ও জীব জন্তুর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও হিতাহিত জ্ঞানের যে পরিমাণ পার্থক্য আছে, হয়ত আমাদের উভয়ের আত্মার মধ্যেও সেই-ভাবের কোনও পার্থক্য বিদ্যমান। ঈশ্বর ঐ সকল জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আমরা ঐ জীব জন্তু হইতেই সৃষ্ট হইয়াছি। এমন অবস্থায় আত্মা যদি শুধু আমাদের মধ্যেই থাকে তাহা হইলে বলিতে হয়, ঈশ্বর এক-দেশদর্শী বা নৈসর্গিক নিয়মের কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট (Fixed) ধারা (Principle) নাই।"

২। "ইহা সত্য যে এ পর্য্যন্ত কোনও প্রেত-চক্রে (Seance) আমি বা আমার পরিচিত কেহ কোনও

প্রকার নিম্ন শ্রেণীর জীব জন্তুর প্রেত-মূর্ত্তি দেখেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রেত-চক্রে ইহাদিগকে আহ্বান করিবার প্রণালী এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মানুষের প্রেত-মূর্ত্তি এই সকল চক্রে উপস্থিত হয়, কারণ আমরা মানুষ মিডিয়মের (Medium) সাহায্য প্রাপ্ত হই। আমরা যদি জীব জন্তুকে মিডিয়ম করিয়া প্রেত-চক্রের অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে আমার স্থির বিশ্বাস আমরা জীব জন্তুর প্রেত-মূর্ত্তিও দর্শন করিব। এমন দিন হয়ত শীঘ্রই আসিবে।”

কনন্ ডয়েলের কথাগুলি যে বিশেষ যুক্তি সঙ্গত, ইহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ পাঠক নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (২)

মানবাত্মার ক্রমোন্নতি

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সবিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষার পর জড়দেহের (কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্যান্ত সকলের) ক্রমোন্নতির কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা জগৎ সৃষ্টির পর্য্যায় মাত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কি নিগূঢ় ব্যাপার সেই পর্য্যায়ে ঘটিয়া আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে তাঁহারা জানিতেন না যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে একটা অমর পদার্থ বাস করিতেছে। তাঁহারা মনে করিতেন যে জীবের জড়দেহের নাশ হইলেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল।

শুনিয়া অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন যে, পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক থিয়োসফিষ্ট (Theosophists) সম্প্রদায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ আলোচনা করিয়াই ক্রমোন্নতি তত্ত্বের নিগূঢ় মূল কারণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জড়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা জড়ের মধ্যে কেবল জড়ের ক্রমোন্নতি জ্ঞাত হইয়াছিলেন, উহার মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ ও উহার ক্রমোন্নতি ধরিতে পারেন নাই বা চেষ্টা করেন নাই। সমগ্র বিশ্বে যে একটা মহাশক্তি কাজ করিতেছে ইহা তাঁহারা

জানিতেন, কিন্তু ঐ মহাশক্তি কেমন সূক্ষ্ম কারণরূপে সর্ব্বপ্রথম কীট পতঙ্গে প্রকাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে মানবদেহে উন্নত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল এ তত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম অতি প্রাচীনকালে আমাদের বেদ, বেদান্ত প্রভৃতিতে বিবৃত হইয়াছিল। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের ক্রমোন্নতি পাশ্চাত্যে সর্ব্বপ্রথম থিয়সফিষ্টরা প্রচার করিয়াছেন (তাহাও আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে)।

এনি বেশান্ত তাঁহার 'The Self and its Seats নামক পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন :—There are various states of consciousness in the Universe as various kinds of living things, and all is life. Professor Huxley dealing with these subjects has pointed out that there is nothing contrary to the analogy of nature in conceiving that there are states of consciousness higher than us; that as there are many lower than human, so there are may be many states of consciouness that rise above that which we speak of as the human, that there may range, stage after stage, grade after grade, consciousness after consciousness, becoming loftier and loftier, greater and greater, wider and wider, in limits; consciousness ever expanding until it is possible to imagine, although not to understand, the consciousness that shall include every thing that exists in the Universe,"

যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহাদের জন্য বেশান্তের উপরোক্ত বিষয়টির মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে বিশ্বে যেমন ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত নানা প্রকারের নানা শ্রেণীর জড়দেহী আছে, সেইরূপ নানা প্রকার ও নানা শ্রেণীর চৈতন্য (বা আত্মা) বিদ্যমান। অধ্যাপক হক্সলে ইহা স্বীকার করেন যে এই জড় সৃষ্টিতে মানুষের আত্মা অপেক্ষা উন্নত এবং অবনত আত্মাও (চৈতন্য) আছে। ইহাও তিনি স্বীকার করেন যে মানুষের আত্মা অপেক্ষা উন্নত আত্মার মধ্যে নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে (মানুষের নিম্নতর জড়দেহীর মধ্যে যখন নানা শ্রেণীর আত্মা রহিয়াছে, তখন তাহাদের উন্নততর আত্মার মধ্যে শ্রেণী বিভাগ অসম্ভব নয়)। মানুষের নিম্নতর ও উন্নততর সমস্ত আত্মার সমষ্টি লইয়াই সেই সর্ব্ব-শক্তিমান পরমাত্মা (ঈশ্বর)।"

আমাদের উপনিষদে এই ভাবটাই বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অন্য প্রকারে বিবৃত হইয়াছিল। "বৈষয়িক আনন্দ সকলেরই এক (উপনিষদের মতে আত্মা না থাকিলে আনন্দ অনুভব করা যায় না)। মনুষ্য জাতির যে আনন্দ, উচ্চতর এবং নিম্নতর কীট পতঙ্গ হইতে দেবতাগণেরও সেই আনন্দ। কিন্তু মানুষের আনন্দ কীট পতঙ্গের আনন্দ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। মানুষ অপেক্ষা দেবতাদির গুণ ও শক্তি অধিক, সেই জন্য তাহাদের আনন্দ মনুষ্য জাতির আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। কীট পতঙ্গের গুণ ও শক্তি মানুষের অপেক্ষা হীনতর, সেই জন্য তাহাদের আনন্দও হীনতর। এইরূপে

পৃথিবী হইতে জীবের শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনত্ব অনুসারে সুখ এবং আনন্দের তারতম্য হইয়া থাকে।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ। ব্রহ্মানন্দ বল্লী। ৮ম অনুবাক।

আমরা এখন বেশ স্পষ্ট দেখিলাম যে সৃষ্টির প্রথম হইতে মানবসৃষ্টি পর্য্যন্ত জড় ও চৈতন্য জগতে ক্রমিক উন্নতির ধারা চলিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞান, উপনিষদ, থিয়সফিষ্ট প্রভৃতি সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছে। এই জন্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই উন্নতির ধারা মানবের মৃত্যুর পরও বর্ত্তমান থাকিবে। যখন ইহা বিজ্ঞান সম্মত যে কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক উন্নতি জড় ও আত্মার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই উন্নতি আমাদের জড়দেহের নাশের পরও চলিতে থাকিবে।

এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা যাহা বিবৃত করিলাম, পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা উহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এইস্থানে প্রদান করিতেছি।

এই পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার জড় সৃষ্টির ধারা বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য যে পৃথিবীর প্রথম জড়জীব কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য জাতি পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়া আসিতেছে। ভগবানের জড়সৃষ্টি ক্রমেই অতি অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নতির দিকে পরিচালিত হইতেছে। ইহাও সর্ব্ববাদি-

সম্মত যে আমাদের মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাহা অমর। ইহাকে আমরা আত্মা নামে অভিহিত করি। আমাদের জড়দেহ যখন কীট পতঙ্গের জড়দেহেরই উন্নত অবস্থা, তখন আমাদের ন্যায় কীটাদিরও আত্মা আছে। সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত যখন আমরা জড়দেহের ও আত্মার একটা ক্রমোন্নতির ধারা দেখিতে পাইতেছি, তখন আমরা বলিতে বাধ্য যে এই ধারা আমাদের পরও চলিতে থাকিবে। এইউন্নতির ধারা অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; এই ধারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইবে ইহা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

ক্রমোন্নতিই যখন সৃষ্টির ধারা, তখন আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে আমাদের পরও এই সৃষ্টির ধারা অক্ষুন্নভাবে চলিতে থাকিবে। যে পরমাণুর দ্বারা কীট পতঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল, আমাদের জড়দেহ ও আত্মা সেই পরমাণুরই সমষ্টি, কিন্তু আমাদের দেহ ও আত্মার পরমাণু কীট পতঙ্গ হইতে বহুগুণে উন্নততর। আমাদের জড়দেহ নাশের পর আমরা যে অবস্থা প্রাপ্ত হইব, তাহার পরমাণু আমাদের অপেক্ষাও উন্নততর হইবে। এই উন্নততর অবস্থাকে আমরা প্রেতাবস্থা বলি। আমাদের জড়দেহের মৃত্যুর পর যে আমরা প্রেত-লোকে গমন করি, ইহা প্রেত-চক্র হইতে আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছি।

প্রেতলোকে আমরা যে দেহ প্রাপ্ত হই, তাহাও পরমাণু

নির্ম্মিত, কিন্তু ক্রমোন্নতি ধারানুসারে উহা এত সূক্ষ্ম যে আমরা উহা দেখিতে পাই না। হয়ত ভবিষ্যতে এমন অণু-বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে, যাহার দ্বারা আমরা ঐ প্রেতমূর্ত্তি অনায়াসে দেখিতে পাইব। পাঠক মনে রাখিবেন, আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে আমরা লক্ষ লক্ষ কীট পতঙ্গ আদৌ দেখিতে পাইতাম না। অথচ তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। প্রেত সম্বন্ধেও আমরা ঠিক ঐ কথা বলিতে পারি। অনেকে অবশ্য গায়ের জোরে এই কথা অস্বীকার করিবে। (প্রেত এখন সহস্র সহস্র লোক প্রেত-চক্রে দেখিতে পায়, তত্রাচ যদি কেহ কেহ বলে যে প্রেত নাই, তাহা হইলে গায়ের জোর ভিন্ন আর কি বলিব। ইহারা অপরের কথা বিশ্বাস করিবে না এবং নিজেরা দেখিবার কোনও প্রকার চেষ্টা করিবে না)

আমরা এই পুস্তকে এবং আমার 'ইহলোক ও পরলোক' পুস্তকের অনেক স্থানে বলিয়াছি যে মানুষের জড়দেহ নাশের (মৃত্যুর) সময় বাসনাহীন না হইলে এবং ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিলে, ওপারে যাইয়া উহার জন্য সাধনা করিতে হয়। এই কার্য্যে অনেক সময় ওপারের প্রেতাত্মারা নবাগত প্রেতকে সাহায্য করে। যাহারা ঐ কার্য্যে সফল মনোরথ হয় তাহারা প্রেতলোক ত্যাগ করিয়া উন্নততর লোকে গমন করে। কিন্তু যাহারা কোনও মতে এই মরজগতের মোহ ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা প্রেতলোকে বহুদিন লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ

করিয়া অবশেষে এই লোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসে। সময় সময় ইহাদের মধ্যে অনেককে নিম্নতর লোকেও যাইতে হয়

ক্রমোন্নতির ধারা যে আমাদের মৃত্যুর পরও অক্ষুন্ন থাকে তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে প্রত্যেক প্রেতাত্মা স্পষ্ট স্বীকার করে যে প্রেতলোকের পর বহুতর লোক আছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন লোকের আত্মারা সকলেই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পরমাণু নির্ম্মিত। ঐ সকল লোকের অধিবাসীদিগকে আমরা 'রাজর্ষি', 'মহর্ষি', 'দেবতা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করি। শুনা যায় কোনও আত্মা যদি ক্রমাগত উন্নতি করিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে অবশেষে সে পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা 'মুক্তি' বলি।

এই স্থানে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিব। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগের সময় ভগবানের নাম স্মরণ বা শ্রবণ করে তাহার পরলোকে মুক্তি হয়। এই জন্যই মৃত্যুকালে হরিনাম শুনাইবার প্রথা আছে। যাঁহারা মনে করেন, আজীবন যে লোক পাপ-পথে বিচরণ করিয়াছে, তাহাকে শুধু মৃত্যুর সময় হরিনাম শুনাইলে তাহার মুক্তি হইয়া যায়, তাঁহাদের জানা উচিত যে, এই বিশ্বাসের কোনও মূল্য নাই।

শুধু মৃত্যুকালে ভগবানের নাম লইলে যে কোনও ফল

হয় না, তাহা গীতার অষ্টম অধ্যায়ের পরবর্ত্তী (ষষ্ঠ) শ্লোক পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, সারা জীবন ধরিয়া যে চিন্তা, যে ভাবনা মনে প্রবল থাকে, মৃত্যুকালে কেবল সেই চিন্তা বা ভাবনাগুলি স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে। যে লোক সারা জীবন পুণ্য-পথে বিচরণ করিয়াছে কেবল তাহারই মনে মৃত্যুকালে ভগবানের স্বরূপ উদয় হয় এবং সে পরলোকে উত্তম গতি লাভ করে। যাহারা আজীবন পরের অনিষ্ট সাধনে অতিবাহিত হইয়াছে তাহাকে যদি মৃত্যুকালে হরিনাম শুনান হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহার মনের মধ্যে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে না। এ কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মনের পরিবর্ত্তন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরপারে আমাদের উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই। বহুদিন ব্যাপী চেষ্টা ভিন্ন (কেবল-মাত্র মৃত্যুর সময় হরিনাম শুনিলে) পাপ কলুষিত মনের পরিবর্ত্তন হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেততত্ত্বে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি কেন

যাঁহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি) দ্বারা আমরা বাহ্যিক জগতের জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকি। কতকগুলি স্নায়ু ঐ পঞ্চেন্দ্রিয় গুলিকে মস্তিষ্কের (brain) সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কোনও বাহ্য বস্তুর অনুভূতি ইন্দ্রিয় হইতে স্নায়ু পথে মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহার পর উহা মনের দ্বারা প্রকাশিত হইলে আমরা বলি যে আমরা অমুক দ্রব্য দেখিলাম বা অমুক কথা শুনিলাম। পঞ্চেন্দ্রিয় স্নায়ুমণ্ডলি, মস্তিষ্ক ও মনের মধ্যে যদি কোনও একটি প্রকৃত অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। সাধারণ ভাবে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা বাহ্য জগত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করি।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে উপরোক্ত পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়া জ্ঞানলাভের আর একটি উপায় আছে। ইহা আধুনিক পণ্ডিত সমাজে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বা sixth sense নামে পরিচিত হইয়াছে। যখন একজনের মনের কথা তুমি চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকেও জানিতে পার, তখন বলা হয়

উহা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের কাজ। মনে কর তোমার কোনও অতি প্রিয় ও নিকট আত্মীয় তোমার নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত অবস্থায় কোনও গুরুতর বিপদে পড়িয়াছেন বা মরণাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত। ঐ অবস্থায় কে যেন তোমার ঐ আত্মীয়ের ঐ বিপদের কথা তোমায় বলিয়া দিল, অথবা তোমার নিদ্রিতাবস্থায় ঐ আত্মীয় স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বিপদের কথা তোমায় জ্ঞাত করিল। জগতের সর্ব্বত্র এই ভাবের বহুতর ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। একজনের মনের সহিত আর একজনের মনের এই যে ভাবের আদান প্রদান, ইহা পাশ্চাত্য জগতে Telepathy নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৯৩৫ সালের ১৭ই মার্চ্চ রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমার বাল্য বন্ধু কা—আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তুমি না আসিলে আমি রক্ষা পাইব না।" ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও পর্য্যন্ত কা—র বিষাদক্লিষ্ট মুখ যেন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। অনেক চিন্তা করিয়াও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না যে আমার স্বপ্ন একটা অমূলক ঘটনা অথবা টেলিপ্যাথি (পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে স্বপ্ন বা জাগ্রতাবস্থায় দুইজনের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান)।

নানা প্রকার চিন্তায় আর সে রাত্রে নিদ্রা আসিল না। আমি তখন ফতেপুরে। বন্ধুবর কা—ঐ সময় মিরাটের

উকীল। প্রাতে আমি তাহাকে একখানি তার দিলাম। বেলা এগারটার সময় জবাব পাইলাম, “তার পাইবামাত্র চলিয়া আইস, বড় বিপদ”। যথাসময়ে মিরাটে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, বন্ধু হাজতে। পুলিস তাহার উপর সঙ্গীন মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে সে সময়ে মিরাটের পুলিসের বড় সাহেব আমার বিশেষ পরিচিত ও আমার পুরাতন ছাত্র। তাহার বিশেষ চেষ্টায় কা—সে যাত্রা কোনও মতে অব্যাহতি পাইল।

পরে কা—র নিকট শুনিলাম যে, যে রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি, সে রাত্রে প্রায় একটার পর নিজের ভীষণ বিপদের কথা চিন্তা করিয়া সে অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে—এবং ঐ বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতে থাকে। ঐ অবস্থায় সে ঘুমাইয়া পড়ে। আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার কথা সে কিন্তু আদৌ ভাবে নাই। মিরাটের পুলিস সাহেবের সহিত যে আমার পরিচয় আছে, সে তাহা জানিত না। আমি যে তাহাকে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি এ সম্ভাবনা তাহার মনে ক্ষণকালের জন্যও উদয় হয় নাই। অথচ সে স্বপ্নে আমার নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। এই ঘটনা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে আমাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যাহার জ্ঞান (আমাদের হিতাহিতের) আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। কা—জানিত না যে আমার দ্বারা তাহার

উপকার হইতে পারে। অথচ তাহার নিদ্রিতাবস্থায় তাহারই এক অজ্ঞাত শক্তি তাহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজের নাম দেশ বিখ্যাত। তাঁহার Why I Believe in Personal Immortality নামক পুস্তকে স্বাপ্ন টেলিপ্যাথির বিষয়ে একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই স্থানে উহা অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সার্ লজের মত লোক যখন ঐ ঘটনাকে নিজের পুস্তকে স্থান দিয়াছেন, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ কাহিনী সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য। পাঠক যদি তাঁহার ঐ পুস্তকে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া গল্পটি পাঠ করেন, তিনি দেখিতে পাইবেন উহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কি প্রকার পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই—

চ্যাফিন্ ইংলণ্ডের একজন সমৃদ্ধিশালী কৃষক। তাহার মৃত্যুর পর দেখা গেল, সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহার তৃতীয় পুত্র মার্সলকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার বিধবা স্ত্রী ও অপর তিন পুত্রকে সম্পত্তির বিন্দুমাত্র অংশ দেওয়া হয় নাই। ১৯০৫ সালের নবেম্বর মাসে ঐ উইল করা হয় এবং ইহার ষোল বৎসর পরে (১৯২১) কৃষকের মৃত্যু হয়। মার্সেল্ পিতার মৃত্যুর পর যখন সম্পত্তি অধিকার করিল, তাহার মাতা বা ভ্রাতারা কোনও প্রকার আপত্তি

উত্থাপন করিল না, কারণ চ্যাফিন্ যে ঐ ভাবের উইল করিয়াছিল তাহা উহারা সকলে জানিত।

সম্পত্তি অধিকৃত হইবার চারি বৎসর পরে (১৯২৫) চ্যাফিনের দ্বিতীয় পুত্র জেমস্ প্রোবেট অফিসে (Probate Office) এক দরখাস্ত পেস্ করে। উহার মর্ম্মার্থ (যতদূর সম্ভব তাহারই নিজের ভাষা ব্যবহার করিয়া) এই—

"১৯০৫ সালের পর বাবা যে তাঁহার সম্পত্তির বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া অন্য আর এক উইল করিয়াছেন, আমার মা আমি ও ভাইয়েরা তাহা আদৌ জ্ঞাত ছিলাম না, কারণ এ সম্বন্ধে পিতা আমাদিগকে কখনও কোনও কথা বলেন নাই। ১৯২৫ সালের জুন মাসের ৪ ও ৫ তারিখে রাত্রি প্রায় এগারটার পর দুইবার আমার স্বর্গীয় পিতা আমার নিদ্রিতাবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হ'ন। আমার বেশ স্পষ্ট বোধ হইল তিনি যেন কিছু বলিবেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। ইহার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে (ঐ মাসের ২৫ শে), তিনি তৃতীয়বার আমার নিদ্রিতাবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন দেখিলাম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে তাঁহার ওভার কোট। তিনি উহার দক্ষিণ দিক্‌কার পকেটটা আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই পকেটে আমার উইল আছে"। তাহার পর তিনি অদৃশ্য হইলেন।

পর দিবস প্রাতে আমি মাকে বাবার ওভার কোটের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে তিনি উহা

আমার ভ্রাতা জনকে দিয়াছেন। জন ঐ সময় প্রায় কুড়ি মাইল দূরে এক গ্রামে বাস করিতেছিল। আমি আমার দুই জন পরিচিত লোককে সঙ্গে করিয়া জনের গ্রামে উপস্থিত হইলাম। (পিতার প্রেতাত্মা যে আমায় দেখা দিযাছেন ইহা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পিতার উইল সম্বন্ধে যে আমি কোনও নূতন কথা জানিতে পারিব তাহা আমার স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল, সেইজন্য আমার কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ দুইজন লোক লইয়া গিয়াছিলাম)।

যথা সময়ে আমরা ওভার কোটের দক্ষিণ দিককার বুক পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিলাম। দেখা গেল উহাতে লেখা আছে "আমার পিতার বাইবেলের জেনেসিসের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ পাঠ কর।"

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইতেছে দেখিয়া আমি আর একজন সাক্ষী (সর্ব্বসমেত তিনজন) সংগ্রহ করিয়া আমার পিতামহের বাইবেলের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। ঐ পুস্তকখানির অবস্থা বিশেষ জরাজীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া উহা আমার পৈত্রিক বাসভবনের (যাহাতে তখন আমার তৃতীয় ভ্রাতা, পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রে বাস করিতেছিল) এক অন্ধকারময় কক্ষে আরও কতকগুলি প্রাচীন পুস্তকের সহিত প্রাপ্ত হইলাম। যখন ঐ পুস্তক আবিষ্কৃত হয়, আমার তৃতীয় ভ্রাতা মার্সেলও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

ঐ পুস্তকের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে দেখা গেল যে,

পুস্তকের দুইখানি পাতা সেলাই করা হইয়াছে। উহা খুলিয়া আমরা ঐ দুই পাতার মধ্যে একখণ্ড কাগজ দেখিতে পাইলাম। উহাই পিতার শেষ উইল। উহাতে লেখা ছিল। "যখন এই উইল পাঠ করা হইবে তখন আমার যে কয়জন পুত্র জীবিত থাকিবে, আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে তুল্যভাবে বিভক্ত হইবে। আমার সমস্ত পুত্রগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ তাহারা যেন তাহাদের জননীকে বিশেষ আদরের সহিত প্রতিপালন করে।"

সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া চ্যাফিনের তৃতীয় পুত্র ঐ নূতন উইল সম্বন্ধে কোনও প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিল না।

উপরোক্ত ঘটনার সমস্ত কাগজ পত্র যাঁহারা পরীক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা সার্ লজের পুস্তক "Why I Believe in Personal Immortality পাঠ করিলে সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হইবেন।

উপরোক্ত প্রকারের ঘটনা সকল পাঠ করিয়া যদি কেহ প্রেত-তত্ত্বকে অলীক মনে করে, তাহা হইলে আমরা বলিব যে যদি ভগবান স্বয়ং তাহাকে বলেন যে প্রেত-তত্ত্ব সত্য, সে ভগবানকে বলিবে, "বাপু হে, তুমি যে আছ, তাহার প্রমাণ কি?"

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে য়ুরোপের কয়েকজন পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক উপরোক্ত প্রকারের টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেকটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

অনুসন্ধান ও আলোচনা করেন। উহাদের মধ্যে যে সকল ঘটনার মধ্যে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল, তাঁহারা সেগুলি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য গুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। "A Census Hallucinations (1894)" এই নামে ঐ সঙ্কলন লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ সকল সংগৃহীত কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি পরলোকগত আত্মা ও জীবিত লোকদিগের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান ছিল।

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ প্রেততত্ত্ব সমিতির Proceedings এ উপরোক্ত A Census of Hallucination, (1894) সঙ্কলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, "It is now clearly established that there is a connection between deaths and apparitions of the dying persons and this is not due to chance alone, this was held as a proved fact." Proceedings S. P. R. vol x. p. 394.

উপরোক্ত A Census of Hallucinations. (1894) সঙ্কলনে যাঁহারা দস্তখৎ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনজন এমন লোক আছেন যাঁহারা সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষভাবে পরিচিত। ইহাঁরা Sir Oliver Lodge Professor and Mrs. Henry Sidgwick. ইহা হইতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা যে সকল ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে

সন্দেহ করিবার কিছুই পান নাই। সেইজন্য তাঁহারা উহা মানিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতে প্রেততত্ত্ব আলোচনার ইতিহাস অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ঐ সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশের পরই সার অলিভার লজ (ঐ সময়ে পাশ্চাত্য জগতে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন) প্রেততত্ত্ব সমিতিতে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন। তাঁহার মত লোক যখন প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিলেন যে প্রেত-তত্ত্ব সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন য়ুরোপ ও আমেরিকার বহুতর অধ্যাপক ও কৃতবিদ্য লোক ক্রমে ক্রমে প্রেত-তত্ত্ব সমিতিতে যোগদান করিলেন। নিম্নে আমরা কয়েক জনের নাম ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাঁদের মত লোক যখন প্রেত-তত্ত্ব সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন যে প্রেত- তত্ত্বে আমরা কেন সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি। শুধু তাহাই নয়। আমি নিজে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ভারতবর্ষ ও বর্ম্মার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় এ সম্বন্ধে সাধ্যমত অনুসন্ধান করিয়াছি এবং তাহাতে বুঝিয়াছি যে প্রেত-তত্ত্ব ষোল আনা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

1. Professor Hans Driesch, Biologist and Philosopher of Cologne and Leipsic Universities.

2. Prof. William Macdougall of Oxford, Harvard and Duke Universities.

3. Prof. Harry Allen Overstract of New York University.

[দ্বিতীর ও তৃতীয় আমেরিকায় সর্ব্ব প্রথম প্রেত-তত্ত্ব সমিতি সংস্থাপনে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।]

4. Prof. Gardner Murphy: Psychologist of Columbia University.

5. C. D. Broad Esqr. Fellow and Lecturer in the moral Science at Cambridge University.

6. Dr. Charles Richet : Professor of Physiology in the University of Paris. ইহাঁর লিখিত দুইখানি পুস্তক Thirty Years' Psychical Research and 'Our Sixth Sense" আজকাল প্রেত-তত্ত্ব জগতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

7. Prof. Sir William Crookes.

8. Prof. Sir William F. Barrett.

9 & 10. Prof. Sidgwick and his wife Mrs. E. M. B. Sidgwick.

11. Dr. Richard Hodgson.

12. William T. Stead Esqr. সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সাময়িক পত্র Review of Reviews এর এই

জগত প্রসিদ্ধ সম্পাদকের নাম হয়ত এখনও লোকে বিস্মৃত হয় নাই।

13. Prof. Morgan.
14. Prof. William James.
15. Prof. James Hervey Hyslop of Columbia University .
16. Dr. Morton Prince of Harvard University.

উপরোক্ত জগত বিখ্যাত লোকেরা যাহাকে সত্য (কারণ ইহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর দণ্ডায়মান) বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাহাকে অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক বলা নিতান্ত গায়ের জোর ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

প্রেত-চক্রে আমরা মিডিয়মের সাহায্যে যাহা দেখিতে পাই তাহাও টেলিপ্যাথি। বহুদূরে অবস্থিত দুইজন জীবিত লোকের মধ্যে জাগ্রত ও নিদ্রিতাবস্থায় যখন ভাবের আদান প্রদান হইতে পারে (এ বিষয়ে শত শত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে), তখন জীবিত ও পরলোকগত আত্মার মধ্যে যে ইহা হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে ? আত্মা অমর ইহা কেহই অস্বীকার করে না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে দুইজন ইহলোকবাসী আত্মার মধ্যে কথোপকথন হয়, ইহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি। তবে পরলোকগত আত্মার সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা কেন হইবে না ?

দ্বিতীয় ভাগ ।

প্রেতাত্মা সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অধ্যাপক ভেনিস্।

১৮৯৬ সাল। আমি তখন কাশীর কুইন্স কলেজের ছাত্র। সুপ্রসিদ্ধ ভেনিস সাহেব (Dr. Venis) তখন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। পারলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি কলেজে সময় পাইলেই আমাদিগকে ঐ বিষয়ে অনেক নূতন কথা শুনাইতেন।

মৃত্যুর পর যে আত্মার বিনাশ হয় না তাহা তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, প্রভৃতি পুস্তক হইতে নানাপ্রকার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইতেন যে, প্রাচীন জগতের ঋষিরা শুধু যে আত্মা অবিনশ্বর বিশ্বাস করিতেন তাহা নয়। তাঁহারা মনে করিতেন যে, পরলোকবাসী আত্মা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে

এ জগতে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। আত্মার ফিরিয়া আসার অনেক কাহিনী তিনি আমাদিগকে শুনাইতেন।

ভেনিস্ সাহেবের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে, মৃত আত্মার ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কাহিনী আমি আদৌ বিশ্বাস করিতাম না। তবে সত্য কথা বলিতে কি এ বিষয়ে কখনও কোনও প্রকার অনুসন্ধান করাও আবশ্যক মনে করি নাই। আমার বন্ধু-বান্ধব কেহ বিশ্বাস করিত না বলিয়া আমিও বিশ্বাস করিতাম না। এই প্রকার গভীর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যে, যথেষ্ট অনুসন্ধানের প্রয়োজন, তাহা কখনও মনে হয় নাই। এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে ভেনিস্ সাহেবের উপদেশ না পাইলে আমি যে আরও দশজনের মত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী থাকিতাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

একদিন ভেনিস্ সাহেব কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে কয়েকজন ছাত্রকে ডাকিয়া পাঠান। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "দেখ, পরলোক সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে অনেক কথা শুনাইয়াছি। এই বিষয়ে যদি স্বচক্ষে কিছু দেখিতে চাও তবে আজ ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটার সময় আমার বাঙলায় উপস্থিত হইও। আর যদি কেহ আসিতে চাহেন সঙ্গে আনিও।"

আমরা তেরজন কলেজের ছাত্র ঠিক পাঁচটার সময় তাঁহার বাঙলায় উপস্থিত হইলাম।

ভেনিস্ সাহেবের বাঙলায় যাইবার সময় পথে আমরা পরলোক সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্ক করিতেছিলাম, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই তেরজনের মধ্যে আমি আর তিনজন, পরলোক সম্বন্ধে ভেনিস্ সাহেবের মত বিশেষ মূল্যবান মনে করিতাম। আমরা জানিতাম যে তিনি এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা আমরা অসঙ্কোচে বিশ্বাস করিতে পারি। অবশিষ্ট নয়জন কিন্তু Sceptics বা সন্দেহবাদীর দল, অর্থাৎ তাঁহারা বলিতেন মানুষ মরিয়া গেলে সব শেষ হইয়া যায়। তাহার হয়ত পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে, কিন্তু অশরীরী মূর্ত্তিতে সে কোনও মতে আর আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তাহাদের মত এই যে তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের চক্ষে কোনও মৃত আত্মাকে না দেখিবে, তাহারা এই সব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না।

আমি বলিলাম যে অধ্যাপক ভেনিসের মত লোক যখন এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন, তখন আমাদের উচিত ইহা বিশ্বাস করা নতুবা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। আমার এই কথায় সন্দেহবাদীদিগের মধ্যে কয়েকজন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "তোমার কলেজের এডুকেশন দেখিতেছি বৃথা হইয়াছে। তুমি ভেনিসের নাম করিতেছ, কিন্তু তোমার

জানা উচিত যে তাঁহাপেক্ষা শতগুণ পণ্ডিত বহুসহস্র লোক স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর সব শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুর পর আত্মার থাকা বা তাহার পক্ষে আবার এখানে ফিরিয়া আসা একেবারে আষাঢ়ে গল্প। তুমি দেখিতেছি, সেই দলের লোক, যাহারা মনে করে যে, "সাহেব লোক যাহা বলিবে তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে।"

এই কথায় বোধ হয় মরা মানুষেরও রাগ হয়। আমি বিশেষ ক্রুদ্ধভাবে একটা বেশ শক্ত রকম জবাব দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম আমাদের অধ্যাপক সান্ন্যাল মহাশয় সহসা সেইখানে উপস্থিত। পরলোক সম্বন্ধে ইনিও অল্প বিশেষ আলোচনা করিতেন বলিয়া, ভিনিস্ সাহেব ইহাঁকেও আহ্বান করিয়াছিলেন। ইনি গাড়ীতে ছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া ইনি গাড়ী ছাড়িয়া আমাদের সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন। অগত্যা আমাদের তর্ক বিতর্ক বন্ধ হইল।

পাঁচ সাত মিনিট পরে আমরা সাহেবের বাঙলায় উপস্থিত হইলাম। তিনি যথাযোগ্য আদরের সহিত আমাদিগকে তাঁহার পাঠাগারে বসাইলেন ও আমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইলেন। ইহার বোধ হয় প্রায় কুড়ি মিনিট পরে চাকর ঘরে আলো রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব উপস্থিত হইলেন ও আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া অন্য এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটি বড় গোল টেবিল

রক্ষিত ছিল। উহার চারিদিকে ষোলখানি armless চেয়ার। আমরা তেরজন ছাত্র, সান্ন্যাল মহাশয় ও ভিনিস সাহেব সর্ব্বশুদ্ধ পনের জন লোক। তবে ষোলখানি চেয়ার কেন? আমরা অনুচ্চস্বরে এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেছি এমন সময়ে ঐ কক্ষে তের চৌদ্দ বৎসরের একটি শ্বেতাঙ্গ বালিকা প্রবেশ করিল এবং সাহেবের পার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল।

সাহেব তাহার হাত ধরিয়া আমাদের সম্মুখে আসিলেন ও বলিলেন, "এই বালিকার নাম মিস্ মেরি। ইহার পিতা আমার বাল্য বন্ধু। আজ প্রায় দেড় বৎসর কাল হইতে ইহার আত্মীয়েরা লক্ষ্য করিতেছে যে, একটা বিশেষ শক্তি ইহার মধ্যে আসিয়াছে। এই শক্তিটা কি তাহা তোমরা এখনই স্বচক্ষে দেখিবে।"

"তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ যে, আজ-কাল অনেকের মতে মৃতের আত্মা সুযোগ পাইলে আবার এই জগতে ফিরিয়া আসিতে পারে। আত্মা অতি সূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত। এই জগতের সমস্তই কিন্তু স্থুল পরমাণুর। এই প্রভেদ আছে বলিয়া মৃতের আত্মা তখনই আমাদের কাছে নিজের শক্তি বা অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে, যখন সে এই জগতের কোনও জড়দেহ সম্পান্ন ব্যক্তির নিকট হইতে স্থুল জড়শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। যে জড়দেহীর নিকট হইতে শক্তি সংগৃহীত হয় তাহাকে ইংরাজীতে Medium বলে। একটি লোকের

মধ্যে কি কি গুণ থাকিলে সে Medium হইতে পারে তাহা আমরা এখনও ধরিতে পারি নাই। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে স্ত্রীলোকেই বেশ ভাল Medium হয়। এই Miss Mary যে একজন ভাল Medium তাহার প্রমাণ আমরা অনেক পাইয়াছি।”

এই সময় অধ্যাপক সান্ন্যাল মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, “আপনার মতে, ওপারের লোক Medium এর সাহায্যে এই পারে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু এ জগতের লোক কি কোনও উপায়ে ওপারে যাইতে পারে?”

ভেনিস্ সাহেব বলিলেন, “নিশ্চয়ই পারে। কেহ যদি নিজের সূক্ষ্ম আত্মাকে জড়দেহ হইতে বাহির করিতে পারে তাহা হইলে সে অনায়াসে ওপারে যাইতে পারে। আপনাদের দেশের অনেক যোগী ইহা করিতে পারে শুনিয়াছি, কিন্তু স্বচক্ষে দেখি নাই। আপনি এদেশের লোক। আপনি চেষ্টা করিলে হয়ত ইহা অনায়াসে স্বচক্ষে দেখিতে পারেন। য়ুরোপ ও আমেরিকায় এখন ওপার হইতে আত্মাকে আনিবার চেষ্টা হইতেছে। আপনি জানেন যে আমাদের (য়ুরোপের লোকের) স্বভাব এই যে আমরা যখন যে কাজ হাতে লই তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলে অন্য কাজে হাত দিই না। পরলোক হইতে আত্মা আনিবার বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইলেই আমরা এপার হইতে ওপারে যাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিব, আর তখন হয়ত ভারত হইতে

আমরা অনেক সাহায্য পাইব। এইবার আমি আপনাদিগকে Miss Mary র ক্ষমতা সম্বন্ধে দুই একটি চাক্ষুষ প্রমাণ দিব।"

এখনও আমরা সকলে দাঁড়াইয়া। সাহেব কাহাকেও বসিতে না বলায় সকলেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। এইবার সাহেব বলিলেন, "এই যে সম্মুখে চেয়ার দেখিতেছ, ইহাতেই আমরা বসিব। এই কক্ষের মধ্যে Mary নিজের ক্ষমতা দেখাইবে। ইহার পূর্ব্বে অধ্যাপক সান্ন্যাল মহাশয় ও অপর সকলকে আমার বিশেষ অনুরোধ যে এই কক্ষ ও ইহার সমস্ত আস্‌বাব বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া হউক। পরে যেন কথা না উঠে যে ঘরের মধ্যে এমন চাতুরী ছিল যাহার সাহায্যে মেরির কাজ দেখান সম্ভব হইয়াছিল।"

আমাদের মধ্যে ছয়জন ছাত্র ও অধ্যাপক সান্ন্যাল প্রথমে ঘরখানা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন—এমন কি প্রাচীর ও Ceiling এর প্রত্যেক অংশ বিশেষ সূক্ষ্মভাবে দেখা হইল। চেয়ারগুলি ও টেবিলটাও বাদ গেল না। এই কক্ষের দুইটি দ্বার ও দুইটি গবাক্ষ ছিল। সাহেবের পরামর্শে ঐ চারিটি বন্ধ করিয়া এমনভাবে চারিখানি কাগজ লাগান হইল যে উহা খুলিবার চেষ্টা করিলে কাগজ ছিঁড়িয়া যাইবে। প্রত্যেক কাগজের উপর দুইজন ছাত্র ও সান্ন্যাল মহাশয় দস্তখৎ করিয়া দিলেন।

ইহার পর আমরা সকলে এক একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট হইলাম। ঘরের আলোটা এমনভাবে মৃদু করা হইল যাহাতে

আমরা পরস্পরকে দেখিতে পাইতে ছিলাম, কিন্তু একটু অস্পষ্টভাবে—অর্থাৎ এই আলোতে দেখা যায় কিন্তু ছাপার অক্ষর পড়া যায় না।

আমরা সকলে বসিয়াছিলাম, কিন্তু মেরি নিজের চেয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আলো কমাইবার পর মেরি যুক্তকরে ও উর্দ্ধনেত্রে বোধ হয় প্রায় দুই তিন মিনিট কাল প্রার্থনা করিল, তাহার পর উভয় হস্ত টেবিলের উপর রাখিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। এইখানে বলিয়া রাখি যে, মেরির একদিকে সান্ন্যাল মহাশয় ও অপর দিকে আমি বসিয়াছিলাম এবং সেই জন্য মেরির সমস্ত কাজ আমাদের দু'জনের বেশ পরিষ্কারভাবে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। আমি ঘটনা ঠিক যে ভাবে দেখিয়াছিলাম, (পরে জানিয়াছিলাম যে) সান্ন্যাল মহাশয়ও ঠিক সেইভাবে দেখিয়াছিলেন।

মেরি উপরোক্তভাবে দাঁড়াইবার বোধ হয় এক মিনিটের মধ্যেই ঘরের মধ্যে এক উজ্জ্বল অথচ বেশ মোলায়েম আলো দেখা দিল। উহা যে কোথা হইতে আসিল তাহা আমরা কেহই ধরিতে পারিলাম না। আলোটা অনুমান অর্দ্ধ মিনিট কাল কক্ষের মধ্যে ঘোরা ফেরা করিয়া যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই অদৃশ্য হইল—সান্ন্যাল মহাশয় এবং কয়েক জন ছাত্রের ধারণা আলোটা মেরির অঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

এই ঘটনার পর আমাদের মনে হইল যেন টেবিলটা

বেশ ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতেছে। দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যে বুঝিলাম টেবিলটা সত্য সত্যই উর্দ্ধে উঠিতেছে। মেরি যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আমার মনে হইল যেন সে বাহ্য জ্ঞান রহিত। অনেকেই হেঁট হইয়া টেবিলের নিম্ন দেশটা পরীক্ষা করিতে লাগিল—হয়ত তাহারা সন্দেহ করিতেছিল যে মেরি হস্ত-পদের কৌশলে টেবিলটা উঠাইতেছিল, কিন্তু সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে এই ঘটনার সহিত মেরির বা ভেনিস্ সাহেবের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। টেবিলটা কিন্তু ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছিল। অবশেষে যখন উহা মেঝে হইতে প্রায় দুই ফুট উঠিল, উহার উর্দ্ধগমন স্থগিত হইল। তাহার পর উহা পুনরায় অতি ধীরে ধীরে নামিতে আরম্ভ করিল। টেবিলের উর্দ্ধে গমন ও পরিশেষে নিজের স্থানে নামিয়া আসিবার কাজে অনধিক চারি মিনিট সময় লাগিয়াছিল। পাঠক মনে রাখিবেন, টেবিলটা এত বড় যে উহার চারিদিকে যোলখানা চেয়ার অনায়াসে বেশ ফাঁক ফাঁক ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। আমি ও অধ্যাপক সান্ন্যাল মহাশয় মেরির দুই দিকে বেশ সতর্ক ভাবে বসিয়াছিলাম। টেবিল উঠাইবার কাজে তাহার কোনও হাত ছিল না। মেরির বয়সের একটি মেয়ে চেষ্টা করিলেও যে অত বড় ভারী টেবিল, দুই ফুট দূরের কথা, তিল পরিমাণও তুলিতে পারিত না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। তবে

উহা কি ভাবে উত্থিত হইল? ইহার উত্তর আমরা কেহই দিতে পারি নাই।

এই ব্যাপার শেষ হইবার ঠিক পরেই হঠাৎ একটি ইংরাজি গীত আমরা শুনিতে পাইলাম। আমি গীত বলিলাম বটে, কিন্তু আসলে উগা কোরস্—এক জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ গলা মিলাইয়া গাহিতেছিল। কণ্ঠস্বরে যদি বয়স ধরা যায় তাহা হইলে আমাদের ধারণা গায়িকার বয়স ত্রিশ চল্লিশের মধ্যে এবং গায়ককে ষাট সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, ঐ গায়ক ও গায়িকা ভেনিস্ সাহেব ও মিস্ মেরি নয়। মিস্ মেরি আমার ও অধ্যাপক সান্ন্যাল মহাশয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। টেবিল উঠিবার ও নামিবার সময় মেরি যেমন নীরব নিষ্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, গানের সময়েও অবিকল সেই ভাবে ছিল। ভেনিস্ সাহেব দুই জন সন্দেহবাদী ছাত্রের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তাহারা পরে বলিল যে, ঐ গায়ক ভেনিস্ সাহেব কিছুতেই হইতে পারে না। তাহারা ভেনিস্ সাহেবের উপর বরাবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল।

আমাদের সকলের মনে হইল গানের শব্দটা ceiling এর নিকট হইতে আসিতেছে। এইখানে বলিয়া রাখি যে ভেনিস্ সাহেবের বাঙলা একতালা।

গীত সমাপ্ত হইলে মেরি সকলকে Good night বলিয়া প্রস্থান করিলে, সাহেব সান্ন্যাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি আজ যাহা দেখিলেন সে বিষয়ে কোনও মতামত দিবেন কি?" সান্ন্যাল মহাশয় বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি, ঘটনা দুইটি আমার বুদ্ধির অতীত। আমার উপস্থিত বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা ইহা বুঝা যায় না। আমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে এই কাজ এমন এক শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে যাহা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অনেক উর্দ্ধে।"

ভেনিস্ সাহেব বলিলেন, "আমি বড় সুখী হইলাম যে, আপনি এই ঘটনাকে এই ভাবে বর্ণনা করিলেন। Chorus এর গান সম্বন্ধে হয়ত সন্দেহ হইতে পারে যে ventriloquism এর সাহায্য লওয়া হইয়াছে (যদিও আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে এই গানের মধ্যে বিন্দুমাত্র ছল বা চাতুরী নাই)। কিন্তু টেবিলের উত্থান পতনের বিষয়ে আপনারা কোনও প্রকার কারণ দেখাইতে পারেন? এ কাজ করা মানুষের সীমাবদ্ধ, ক্ষমতার অতীত।" ইহার পর তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সকলকে আমার একান্ত অনুরোধ যে, তোমরা অবসর পাইলেই পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে এবং এ বিষয়ে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর পুস্তক প্রকাশ হইতেছে। এ বিষয়ে যদি আমি তোমাদের কাহাকেও কোনও প্রকার সাহায্য করিতে পারি, বিশেষ আনন্দিত হইব। শেষ একটা কথা আমি

আবার বলি—মৃত্যুর পর আত্মা থাকে ও তাহাকে সুযোগ দিলে সে পুনরায় এই জগতে ফিরিয়া আসিতে পারে। অনেক সময় সে জড়দেহ ধারণ করিয়া আসিতে পারে।”

ইহার পর ভেনিস্ সাহেব আমাদের (কয়েক জনকে) জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন। গোঁড়া জাতীয় কয়েক জন ছাত্র ম্লেচ্ছের বাড়ী জলস্পর্শ করিল না।

এইস্থানে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে কালে ভেনিস্ সাহেব পাণ্ডিত্যের জন্য জগত বিখ্যাত ছিলেন। সংস্কৃতে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁহার গভীর দৃষ্টি ছিল। তাঁহার মত এক জন লোক যে কয়জন ছাত্রকে ইন্দ্রজাল দেখাইয়া ঠকাইয়াছিলেন, যাহারা তাঁহাকে জানে কেহই ইহা স্বীকার করিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার চীন ও বর্ম্মার অভিজ্ঞতা

একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে কলেজে যদি ভেনিস্ সাহেবের উপদেশ না পাইতাম তাহা হইলে পরলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার আকাঙ্ক্ষা (taste) আমি এ জীবনে হয়ত কখনও অনুভব করিতাম না। সাহেব ঐ বিষয়ে আমার মনে যে কৌতুহল জাগাইয়া দেন তাহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার জন্য আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব। অনেকে বলে, নিয়মিতভাবে গীতা পাঠ করিলে জীবনে নাকি বিশেষ শান্তি অনুভব করা যায়। মৃত্যু নাকি তাঁহাদের নিকট ছেলেখেলা মনে হয়। হয়ত ইহা সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমি পাঁচ সাত জন এমন বন্ধু বান্ধবকে জানি যাঁহারা নিয়ম করিয়া প্রত্যহ অনধিক এক অধ্যায় গীতা পড়েন। কিন্তু মৃত্যুর বিষয়ে তাঁহাদের ধারণা এ প্রকার ভীতিপ্রদ যে, উহার নাম শুনিলে তাঁহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠেন এবং স্পষ্টই বলেন, “এত ভাল ভাল শাস্ত্র গ্রন্থ পড়িলাম; কিন্তু মৃত্যুর পর যে কি হইবে তাহার বেশ স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাইলাম না। যাহা কিছু বলা হইয়াছে নিতান্ত ভাসা ভাসা। তাহাতে মনের মধ্যে কোনও জোর

পাই না। তাহাও কি ছাই সকলের এক মত। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়াছেন। কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে বিশ্বাস করা উচিত তাহা কে বলিয়া দিবে?"

আমি চিরজীবন পরলোক-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস (কারণ ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছি) যে, মৃত্যু জড়দেহের এক পরিবর্ত্তন মাত্র। ইহ জীবন অপেক্ষা পরবর্ত্তী জীবন যে সর্ব্বোতোভাবে সুখময় ও শান্তিপূর্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পরলোক-তত্ত্বের আলোচনা করিলে সর্ব্বপ্রধান ফল এই হয় যে, মৃত্যু ভয় আদৌ থাকে না। কাহারও কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে পরলোক-তত্ত্বজ্ঞ জানে যে, এই ছাড়াছাড়ি দুদিনের মাত্র। তাহার মৃত্যুর পর সে পুনরায় ঐ আত্মীয়ের সহিত মিলিত হইবে। এমন উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে মৃত আত্মাকে আমরা অনায়াসে আবার ইহলোকে কিয়ৎক্ষণের জন্য ফিরাইয়া আনিতে পারি এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন পর্য্যন্ত করিতে পারি। আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, আমি উপরে যাহা বলিলাম তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। প্রেত-তত্ত্ব আলোচনা করিলে যেমন সহজে মৃত্যু ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়, শত শত শাস্ত্র গ্রন্থ পড়িলে তাহার কণামাত্রও হয় না। পাঠকেরা যদি দয়া করিয়া প্রেত-তত্ত্ব আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে আমার এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

কলেজ ছাড়িবার পর আমাকে চাকরী উপলক্ষে প্রায় দুই বৎসর বর্ম্মায় থাকিতে হইয়াছিল। কলেজে ভেনিস্ সাহেব মনে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। বর্ম্মা প্রবাসের সময় যখনই অবসর পাইতাম আমি পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতাম। এ সম্বন্ধে আমি সেখানে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম তাহারই কয়েকটি কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

১। ভামো উত্তর-পূর্ব্ব বর্ম্মা সীমান্তের সর্ব্ব প্রধান সহর। পেশোয়ার সুরক্ষিত রাখিবার জন্য ইংরাজ যে প্রকার আয়োজন করিয়াছেন, ভামো সহরকে শত্রুর আক্রমন হইতে রক্ষার জন্য তাঁহারা ঠিক সেই বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই সহরের কোনও কোনও স্থানে মাত্র সতের মাইল উত্তর-পূর্ব্বে চীন সাম্রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। (১৯০০ খৃঃ)

আমি সর্ব্ব প্রথম এই ভামোর Military Police Department এর Audit এ কাজ করিতাম। ভামো জেলার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আঠারটা Military out posts ছিল। ইহাদের নাম out posts ছিল বটে; কিন্তু আসলে উহারা এক একটি সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দুর্গ। এই আঠারটা out posts এ আঠারটা অফিস ছিল। তিন মাসের মধ্যে অনধিক একবার করিয়া প্রত্যেক office এর হিসাব আমার পরীক্ষা (audit) করিতে হইত। সেকালে Car বা Cycle এর ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। ভামো হইতে প্রত্যেক out post এ আমায় সরকারী

ঘোড়ায় যাইতে হইত। পথ ছিল বটে; কিন্তু উহা এমন গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া যে, উহা আদৌ নিরাপদ ছিল না। হস্তী, ব্যাঘ্র এবং ভল্লুক ঐ জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহা ছাড়া ওয়াজ, সান্ প্রভৃতি অসভ্য লোকেরা সুবিধা পাইলে পথিককে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। এই জন্য ঐ tour এর সময় আমার সহিত চারিজন অস্ত্রধারী সিপাহী ঘোড়ার উপর আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। ইহা ছাড়া অবশ্য দুইজন ভৃত্য আমার সঙ্গে থাকিত। গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া ইহাদের জন্য দুইটা বন্দুক ও দুইখানা ভূজালি দিয়াছিল।

সকলেই জানে বর্ম্মিরা বৌদ্ধ। ধর্ম্মে ইহাদের যে বিশেষ আস্থা আছে, ইহা বলা যায় না। ইহাদের ধর্ম্ম নাকি শিক্ষা দেয় যে, যাহারা গৃহস্থ তাহাদের নিয়ম কানুন মানিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। প্রত্যেক গ্রামে বা সহরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ফুঙ্গি বাস করে। গৃহস্থের ধর্ম্ম কর্ম্মের সমস্ত ভার এই ফুঙ্গিদের উপর। যে গ্রামের লোক সংখ্যা এক শতের অধিক হইবে না, সেখানেও অনধিক পনের কুড়ি জন সন্ন্যাসী আছে। গ্রামের বা সহরের সমস্ত গৃহস্থ অধিবাসীরা সমস্ত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভার এই ফুঙ্গিদিগের উপর প্রদান করে। ইহার পরিবর্ত্তে গৃহস্থেরা ঐ ফুঙ্গিদিগের ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ ভার লইয়া থাকে।

ফুঙ্গিরা গ্রামের বা সহরের প্রান্তে বৌদ্ধ মন্দিরে বাস করেন। এ দেশে এই মন্দিরকে ফুঙ্গি-চাঙ বলে। গ্রামের বা সহরের সমস্ত ছোট ছোট বালক বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার ভার এই ফুঙ্গিদের উপর। প্রত্যেক বালক বালিকাকে শৈশবের কিয়দংশ ফুঙ্গিদিগের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। এই জন্য এ দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা দুই তিন জনের অধিক নয়।

আমি বর্ম্মায় থাকিবার সময় এই ফুঙ্গিদিগের সহিত যথেষ্ট মিশিয়াছি এবং একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও চরিত্রহীন। তবে ভাল লোক যে একেবারে নাই তাহা বলিতেছি না। তবে তাহাদের সংখ্যা কম।

ভামো সহর ও উহার আশে পাশে এক মাইলের মধ্যে বাষট্টিটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল এবং উহার মধ্যে প্রায় আড়াইশত জন ফুঙ্গি বাস করিত। ইহাদের মধ্যে পাঁচ সাত জন ছাড়া অপর সকলেই গৈরিকধারী মাত্র। ইহারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সব কাজই করিত।

উপরোক্ত পাঁচ সাত জনের মধ্যে একজনকে আমি বেশ ভাল করিয়াই জানিতাম। ভামো সহরের উত্তরদিকে চীনা পল্লী। ইহার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র ফুঙ্গি-চাঙে ইনি দুইটি শিষ্যের সহিত বাস করিতেন। ইহাঁরই মুখে শুনিয়াছি, ইনি দক্ষিণ চীনের লোক। প্রায় ষাট বৎসর হইল ইনি ভামোতে

আসেন। তাহার পর আর স্বদেশে যান নাই। আমার সহিত যখন ইহাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখন ইহাঁর বয়স প্রায় বিরাশি বৎসর। কিন্তু তাঁর অটুট স্বাস্থ্য দেখিয়া ইহাঁর বয়স সত্তরের অধিক মনে হইত না।

লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার ইহাঁর নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল। বর্ম্মিস্‌দের সহিত ইনি প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার এবং আমার মত বিদেশী লোকের সহিত রবিবারে সাক্ষাৎ করিতেন। আমার ভামো গমনের প্রায় একমাস পরে প্রায় প্রত্যেক রবিবার আমি ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইতাম। তিনি বলিতেন যে, আমরা যে শুধু চেষ্টা করিলে পরলোকগত আত্মার সহিত দেখা করিতে পারি তাহা নয়। আমরা তাহাদের সাহায্যে এমন অনেক কাজ অতি অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি যাহা এ জগতের লোকের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তিনি আমাকে বেশ স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলেন যে সন্ধ্যার পর তিনি যে কোনও সময়ে প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিতে পারেন এবং কয়েকজন প্রেতাত্মা তাঁহার গোলামের মত তাঁহার আদেশ পালন করে।

ভেনিস্‌ সাহেবের শিক্ষা গুণে আমি প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু চীনা ফুঙ্গির ঐ অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পরিলাম না। এ যেন আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের কাহিনী। আলাদীন প্রদীপের সাহায্যে অনেক অত্যদ্ভুত কাজ করাইয়া লইত,

আর এই ফুঙ্গি মহাশয় নাকি শুধু মুখের কথায় প্রেতদিগকে গোলামের মত খাটাইয়া লইতেন। এত বড় 'আষাঢ়ে গল্প' আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

সিন্‌লম্ কাবা ভামোর একটা out post। সহর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় আটত্রিশ মাইল। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় হুকুম আসিল যে, সাত তারিখে আমায় তথায় যাইতে হইবে। তথাস্তু। মাঝে আর একটা দিন। বৈকালে বাসায় বসিয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল একবার চীনা ফুঙ্গির সহিত দেখা করিতে হইবে। সে দিন বুধবার—আমার সহিত দেখা করিবার নির্দ্দিষ্ট দিন নয়। কিন্তু সে বাধা গ্রাহ্য না করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলাম। তাঁহার ফুঙ্গি-চাঙে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঠিক দ্বারের উপর তাঁহার প্রধান শিষ্য দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে বলিল "বাবুজি, দেবতা (তাঁহার গুরু) আপনাকে গ্রহণ করিবার জন্য আমায় এইখানে অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছেন।" আমি 'ভাল' বলিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিব এমন সময় মনে হইল যে, আমার আজ এ সময় এখানে আসিবার সংবাদ আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, তবে সন্ন্যাসী কি প্রকারে জানিল?

এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমি যখন সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলাম, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি আজ এ সময় আপনার নিকট আসিব, ইহা আপনাকে কে বলিল?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "শুধু যে তোমার এখানে আসিবার কথা জানিতাম, তাহা নয়। তুমি পরশ্ব প্রাতে সিন্‌লমে যাইবে, তাহাও আমি জানি।" আমি স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আমার Department এর কর্ম্মচারী ও সিপাহীদিগকে প্রায়ই এখানে সেখানে যাতায়াত করিতে হইত। এ সকল সংবাদ কিন্তু সামরিক নিয়ম অনুসারে বিশেষ গোপনীয় ভাবে রাখা হয়। আমি যে সিন্‌লম্ যাইব এ সংবাদ আমাদের battalion এর সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী ও আমি ছাড়া আর কেহই জানিত না। আমার সঙ্গে যে সমস্ত সিপাহী যাইবে তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানের কথা আমাদের সহর ছাড়িবার মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বলা হইবে। ভামো সীমান্ত সহর, এখানে পদে পদে বিপদ আপদের সম্ভাবনা। সেইজন্য এখানে এত কড়াকড়ি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সিন্‌লম্ যাইবার সংবাদ প্রধান কর্ম্মচারী ও আমি ছাড়া আর কেহই জানিত না। তবে ইহা সন্ন্যাসী জানিল কেমন করিয়া?

আমার এই ভাব দেখিয়া তিনি যেন ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "তোমাকে আমি কতবার বলিয়াছি, যে ওপারের প্রেতাত্মা আমার হুকুমে কাজ করে। এ অবস্থায় তোমার সিন্‌লম্ যাইবার সংবাদ ও এ-সময় আমার কাছে তোমার আসার কথা জানা কি অসম্ভব মনে কর?" কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু আমার জানা

উচিত ছিল যে, তোমরা ইংরাজি নবিশের দল এ সব কথা বিশ্বাস কর না। যাহা ইংরাজি পুস্তকে পড় নাই তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে তোমরা বিশ্বাস কর না। ভাল কথা তোমাকে এমন একটা ঘটনা দেখাইব যাহাতে তোমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে আমার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তুমি পরশ্ব সিন্‌লমে যাইতেছ। এই পথে তের মাইলের পর তোমার উপর এক বিষম বিপদ আসিবে। তোমার সঙ্গে যে সিপাহী থাকিবে তাহাদের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইবে না। যে স্থানে বিপদ আসিবে সেইস্থানে রাস্তার বামদিকে একটা খুব বড় শাল গাছ পাইবে। তাহার উপর কোনও মতে চড়িতে পারিলে তোমার আর কোনও ভয় থাকিবে না।”

তাঁহার এই কাহিনী নিতান্ত ‘গাঁজাখুরি’ বলিয়া মনে হইল। অতি কষ্টে হাসি দমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিপদটা কি জানিতে পারিয়াছেন কি?” সন্ন্যাসী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “এখনও অবিশ্বাস! তবুও তোমার প্রশ্নের জবাব দিব। কারণ তোমাকে দেখাইতে হইবে যে, আমাদের দেশে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা সাহেবেরা জানে না। বিপদটা আসিবে বন্য জানোয়ার হইতে।”

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি রওয়ানা হইলাম। সে দিন আমার সঙ্গে দশজন সিপাহী যাইতেছিল। ইহারা সকলে সিন্‌লমে বদলি হইয়াছিল। ইহাদের স্থানে যাহারা ভামোয় আসিবে

তাহাদিগকে আমি ফিরিবার সময় সঙ্গে লইয়া আসিব। ইহা ছাড়া দুইজন সশস্ত্র ভৃত্যও আমার সঙ্গে চলিল।

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা এগার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এক 'পড়াওএ' (Camping ground) গতি রোধ করিয়া আহারাদি করিলাম ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা দুইটার সময় আবার রওয়ানা হইলাম।

আমাদের সঙ্গে যে দশ জন সিপাহী যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে হাবিলদার ভাগসিংহের সহিত ভামো হইতেই আমার জানা শুনা ছিল। বন্দুক পরিচালনে সমস্ত battalion এ তাহার বেশ নাম ছিল। ভামো হইতেই এ আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। তাহার সহিত নানা প্রকার গল্পগুজবে সময়টা বেশ ভালই কাটিতেছিল। দ্বি-প্রহরের পর যখন আমরা পুনরায় কুচ আরম্ভ করিলাম, হঠাৎ আমার চীনা সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেইত তের মাইল উপস্থিত হইবে। সন্ন্যাসী যখন ভামোয় এই কাহিনী বিবৃত করেন, তখন কথাটা নিতান্ত আজগুবি মনে হইয়াছিল। কিন্তু তের মাইল যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আমি মনের মধ্যে বেশ একটু অশান্তিভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন ভাগসিংহকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলাম। ভাগসিংহ এই কাহিনী শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের গতিরোধ করিল ও অন্যান্য সকলকে দাঁড় করাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা এখন কত মাইলে?" আমি অঙ্গুলি

নির্দ্দেশে সম্মুখে দেখাইয়া বলিলাম, "ঐ সাম্‌নে বার মাইলের পাথর।" ভাগসিংহ কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া বলিল, "বাবুজি! আমি প্রায় সাতাশ বৎসর ভামোয় আছি। ঐ চীনা সন্ন্যাসীকে আমি ভাল করিয়াই জানি। উহার অলৌকিক ক্ষমতার অনেক গল্প আমি শুনিয়াছি। আমাদের দেশে এই জাতীয় লোককে 'ভূতসিদ্ধ' বলে। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, এই তের মাইলটা আমাদিগকে খুব সাবধানের সহিত যাইতে হইবে। আমি এখনই ইহার বন্দোবস্ত করিতেছি।"

যে স্থানের ভিতর দিয়া আমরা এই সময় যাইতেছিলাম, তাহার সামান্য একটু বর্ণনা আবশ্যক। চারিদিকে গভীর জঙ্গল। তাহারই মধ্যে আঠার ফুট চওড়া রাস্তা। এই জঙ্গল এত গভীর যে, বেলা দুইটার সময়েও তাহার অধিকাংশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন—মনে হইতেছিল যেন এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই বা সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। হিমালয় ও মধ্য ভারতের অনেক গভীর অরণ্য আমি দেখিয়াছি, কিন্তু উত্তর বর্ম্মার এই জঙ্গল অতুলনীয়।

ভাগসিংহ দুই জন অল্প বয়স্ক সিপাহীকে আমাদের দলের প্রায় দুই ফর্‌লং অগ্রে অগ্রে গমন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, কোনও প্রকার বন্য জন্তুর সাক্ষাৎ পাইলে তাহারা যেন আমাদিগকে বিউগেলের সাহায্যে জানাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। আমাদের দল এখন, এক এক জন এক এক লাইন, ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলের অগ্রে রহিল

ভাগসিংহ ও সর্ব্ব পশ্চাতে আমি। প্রত্যেকের কোমরে প্রকাণ্ড ভূজালি ও হাতে এক একটা দোনলা বন্দুক।

আমরা যথা সময়ে তের মাইলে উপস্থিত হইলাম। এইখানে রাস্তা একেবারে সরলভাবে যাওয়াতে উহার বহু দূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমাদের দুই জন অগ্রদূতকে (Pioneer) আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। তের মাইল আরম্ভ হইবার বোধ হয় তিন ফর্‌লং পরে দেখিলাম একজন Pioneer সজোরে bugle বাজাইয়া দিল এবং তাহার পর অতি দ্রুতবেগে আমাদের নিকট আসিতে লাগিল। ব্যাপরটা যে কি তাহা Pioneers রা জানাইবার অগ্রেই আমরা অনেকটা স্পষ্টভাবে স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। এক বৃহৎ হাতীর দল সড়ক ও উহার দুইধারের জঙ্গলের অনেকাংশ অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের আর অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। Pioneer দুইজন যখন আমাদের নিকট উপস্থিত হইল তখন বুঝিলাম যে, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর। দুইটা প্রকাণ্ড দাঁতওয়ালা হাতী যুদ্ধ করিতেছে, অবশিষ্ট সকলে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে। এ সময় যদি উহারা আমাদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিবে। (১)

(১) পাঠক মনে রাখিবেন, প্রত্যেক হাতীর দলে একাধিক দাঁতওয়ালা হাতী (পুং হস্তী) থাকে না। এই জন্য গৃহিণীশূন্য হাতীকে প্রয়োজন হইলে গৃহস্থ হাতীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এই প্রকার যুদ্ধে হস্তিনীরা কোনও পক্ষকে সাহায্য করে না।

কি করা যায়, পরামর্শ করিতেছি, এমন সময় অতি উচ্চৈঃস্বরে বৃংহতি ধ্বনি হইল ; পর মুহূর্ত্তে দেখিলাম, সেই প্রকাণ্ড হস্তীর দল সবেগে আমাদের দিকে আসিতেছে। আমরা সর্ব্ব সমেত তের জন ছিলাম, সকলেই সশস্ত্র ; কিন্তু চক্ষুর নিমিষে ঐ বার জন লোক আপনাপন বন্দুক ফেলিয়া দিয়া যে কি প্রকার ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করিল, তাহা অন্য সময় হইলে আমি নিশ্চয়ই বেশ উপভোগ করিতাম ; কিন্তু তখন ইহার সময় ছিল না। এই সময় আমার হঠাৎ মনে হইল সন্ন্যাসীর উপদেশ—'বাম দিকে একটা খুব বড় শাল গাছ পাইবে'। বাম দিকে চাহিয়া দেখি সত্যই একটা প্রকাণ্ড শাল গাছ। তাহার ঠিক গায়ে আর একটা ছোট গাছ থাকাতে উহার উপর আরোহণ করা বিশেষ দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইল না। আমার নিকট বন্দুক ছিল না বটে, কিন্তু পকেটে একটা রিভলবার ছিল। আমি আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া বোধ হয় চারি পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে সেই বড় শাল গাছের উপর উঠিয়া বসিলাম।

আমার সঙ্গে ঘোড়া ছিল বটে, কিন্তু ভাগসিংহ আমাদের চালক (leader) হইবার পর আমি পদব্রজে আসিতেছিলাম। আমার ঘোড়া এবং আমাদের দ্রব্যাদি বহনকারী তিনটা খচ্চর্ (mules) আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। আমি গাছে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে আমার ঘোড়ার পশ্চাদ্দেশে সজোরে চাবুক কষাইলাম। যেদিক হইতে আমরা আসিতে-

ছিলাম সে অতি দ্রুতবেগে সেই দিকে ছুটিল। সে ছুটিল বলিয়াই হউক, কিম্বা হাতীগুলিকে দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়াই হউক, খচ্চর্ তিনটা আমার ঘোড়াকে অনুসরণ করিল।

আমি বৃক্ষে আশ্রয় লইবার বোধ হয় অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে হাতীগুলি আমার বৃক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কয়েকটা আসিয়া ঐ বৃক্ষকে ঘেরিয়া ফেলিল, কয়েকটা রাস্তার উপর দাঁড়াইল এবং কয়েকটা খচ্চর্গুলার পশ্চাদনুসরণ করিল। তাহাদের পৃষ্ঠে বোঝা থাকাতে দৌড়িবার যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছিল। সেই জন্য একটা অবিলম্বে ধরা পড়িল। একটা হাতী শুঁড়ের সাহায্যে তাহাকে চক্ষুর নিমিষে ভূ-পাতিত করিয়া সামনের একটা পা তাহার উপর সজোরে স্থাপিত করিল। ইহার পর যাহা হইল তাহা না বলিলেও চলে।

একটা খচ্চর্ ধরা পড়াতে পশ্চাদনুসরণকারী হাতীগুলিও আর অগ্রসর হইল না। অবশিষ্ট খচ্চর্ দুটা রক্ষা পাইল। এইবার আমার নিজের কথা বলি। ছয়টা হাতী আমাকে ঘিরিয়াছিল। দেখিলাম তাহাদের মধ্যে একটার মাত্র সুদীর্ঘ দন্ত রহিয়াছে। সে গাছের তলায় আসিয়া যতদূর পারিল শুঁড় উঁচু করিয়া আমায় ধরিবার চেষ্টা করিল। যখন বুঝিল আমি তাহার নাগালের বাহিরে, তখন কয়েক বার বৃক্ষটা প্রদক্ষিণ করিল তাহার পর গাছটা শুড়ে জড়াইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সেই বিশাল গাছকে জড়াইতে না পারিয়া সে

একস্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইল ও আমার প্রতি অতি ক্রুদ্ধভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অপর পাঁচটা হাতী ঐ বৃক্ষের নিকট হইতে খানিক দূরে সরিয়া গেল এবং বোধ হইল তাহারা পরামর্শ আঁটিতেছে। তাহার পর তাহারা একে একে সেই বৃক্ষের উপর সজোরে ধাক্কা লাগাইতে লাগিল। সে কি ধাক্কা! প্রত্যেক ধাক্কার পর সেই সুবিশাল বৃক্ষ সজোরে হেলিতে ও দুলিতেছিল। অবশ্য আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হাতীর আক্রমণে আমার আশ্রয় বৃক্ষের এমন কোনও ক্ষতি হইবে না যাহাতে আমার অনিষ্ট হয়। সেই জন্য আমি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে হাতীদের এই তামাসা দেখিতে ও উপভোগ করিতে লাগিলাম। এই সময় খচ্চর্‌দের পশ্চাদনুসরণকারী হাতীগুলিও বৃক্ষের সম্মুখের সড়কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহারাও বোধ হয় তাহাদের সঙ্গীদিগের এই ব্যর্থ প্রয়াসে মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতেছিল। তাহাদের মনের ভাব বলিতে পারি না; কিন্তু তাহারা এই আক্রমণে যোগ দিল না।

এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতীত হইল। তখন আমার মনে হইল যে, ইহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সম্ভবতঃ আজকার অবশিষ্ট বেলাটুকু ও সমস্ত রাত্রি এই ভাবে আমাকে ঐ বৃক্ষে কয়েদ থাকিতে হইবে। সমস্ত রাত্রি দূরের কথা, আমি এই এক ঘণ্টার মধ্যেই বিলক্ষণ ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলাম। আর কিছুক্ষণ এই প্রকার আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে হয়ত পড়িয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে

আমার যে কি দশা হইবে তাহা অনুমান বোধ হয় একটা বালকেও করিতে পারে। সেই জন্য আমি উহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। কর্ত্তব্য স্থির হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

দলপতি হস্তী ঐ সময় আমার বৃক্ষের নিকট হইতে আন্দাজ দশ বার হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার পকেটে একটা রিভলবার ছিল। আমি উহা হাতে করিয়া হাতীটার চক্ষের উপর লক্ষ্য করিয়া বসিয়া রহিলাম; কিন্তু সে এত ঘুরিতে ফিরিতে ছিল যে, গুলি চালাইতে আমার সাহস হইতেছিল না। আমি জানিতাম, গুলি উহার ঠিক চক্ষে বা রগে না লাগিলে উহাতে হাতীর বিশেষ কোনও অনিষ্ট হইবে না। বরং সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া হয়ত গাছতলা একেবারে ছাড়িবে না। এই সময় হঠাৎ আমারএক কৌশলের কথা মনে হইল। আমি আমার রুমালটা গাছের এমন একটি শাখায় আট্‌কাইয়া দিলাম যাহাতে উহা হাওয়ায় উড়িতে থাকে। ইহার পর আমি যাহা চাহিতেছিলাম তাহাই হইল। হাতীর দৃষ্টি ঐ রুমালের উপর পড়াতে সে একস্থানে দাঁড়াইয়া বিশেষ আশ্চর্য্যভাবে উহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অৰ্দ্ধ মিনিটের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া আমি গুলি চালাইলাম। জয় জগদীশ! গুলি ঠিক চক্ষুর (দক্ষিণ) উপর লাগিল। তাহার পর যাহা হইল তাহাকে ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধের সহিত অনায়াসে

তুলনা করা যাইতে পারে। হাতীটা প্রথমে এমন ভাবে চীৎকার করিল যে, আমি সে প্রকার ধ্বনি জীবনে কখনও শুনি নাই। তাহার পর বোধ হয় তিন চারি সেকেণ্ড সে সেই স্থানে চক্রাকারে সবেগে ঘুরিতে লাগিল। ঐ সময় যে সকল হস্তী তাহার সম্মুখে পড়িল, তাহারা পদাহত ফুটবলের মত চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর সে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে করিতে যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে দুই তিন মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। বলা বাহুল্য তাহার সঙ্গীরা তাহাকে অনুসরণ করিতে ভুলিল না। প্রায় দশ মিনিট কাল অপেক্ষা করিবার পর যখন বুঝিলাম যে, তাহাদের ফিরিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলাম। সঙ্গীরাও প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে ফিরিয়া আসিল।

—):*:(—

(২)

আমার ভামোয় প্রায় এক বৎসর অবস্থানের পর চীনের সহিত সীমান্ত লইয়া বর্ম্মা সরকারের মত বিরোধ হইল। তখন China Burma Boundary Commission সংগঠিত হইল। এই উপলক্ষে কমিসনের ইংরাজ কর্ম্মচারী-দিগের হেফাজতের জন্য পাঁচ শত সৈন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে খাস Military Department এর দেড় শত জন গোরা সৈন্য ও সাড়ে তিন শত জন Military Police এর দেশী সিপাহী। শেষের সকলেই আমাদের battalion হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ার বিপিন বাবু, গোমস্তা খগেন বাবু ও আমি ছাড়া আর কোনও বাঙ্গালী ছিল না।

আমরা অবিলম্বে বর্ম্মা ছাড়িয়া চীনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রত্যহ আমরা সাত আট মাইলের অধিক যাইতাম না। কোনও কোনও স্থানে সার্ভের জন্য ছয় সাত দিন থাকিতে হইত। উত্তর বর্ম্মা ও দক্ষিণ চীন যেখানে মিলিয়াছে সে স্থানটা পর্ব্বত ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই জঙ্গল ও পর্ব্বত দক্ষিণ চীনে বহুদূর ব্যাপী ছিল। আমরা চীনের ভিতর প্রায় আশী মাইল গমনের পরও ইহার শেষ দেখিতে পাই নাই।

আমাদের যাত্রার প্রায় চারি মাস পরে একদিন অপরাহ্ণে আমরা ফুংচি নামক এক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় চারি হাজার। আমরা গ্রামের বাহিরে এক বৃহৎ ময়দানের এক পার্শ্বে তাঁবু ফেলিলাম। শুনিলাম এখানে আমাদিগকে কয়েক দিন থাকিতে হইবে।

পর দিন প্রাতে আমরা তিনজন বাঙ্গালী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধ ছিল না। এইখানে বলিয়া রাখি যে, এই প্রকার সামরিক অভিযানে সঙ্গের সৈনিক ও সিভিল কর্ম্মচারীরা বিনা

আদেশে কোনও গ্রাম বা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র উল্লেখ যোগ্য রাস্তা। আমরা এই রাস্তার উপর দিয়া অগ্রসর হইলাম। দুই পার্শ্বে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাস ভবন ও দোকান-ঘর। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখভাগ ফুলের টব, লতা, পাতা এবং লাল বর্ণের কাগজের দ্বারা সজ্জিত। খানিক দূর যাইবার পর একটি দোকান হইতে একটি লোক আমাদিগকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ডাকিল। এই ঘোর বিদেশে একটু বিস্মিত ভাবেই আমরা তাহার দোকানে উপস্থিত হইলাম। তখন সে উর্দ্দু ভাষায় বলিল, "বাবু! আমি ভারতবর্ষের লোক। আমার বাড়ী আগ্রা জেলায়। আপনারা বসুন।" আমরা উপবিষ্ট হইলে সে প্রথমে আমাদিগকে পান ও সিগার দিল, তাহার পর সংক্ষেপে নিজের কাহিনী শুনাইল। তাহার বয়স যখন তের চৌদ্দ বৎসর তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাহাকে পালন করিবার আর কোনও আত্মীয় না থাকাতে সে কলিকাতায় যায় ও সেখানে এক বাঙ্গালী বাবুর চাকর হইয়া ভামোয় উপস্থিত হয়। দুই বৎসর পরে বাবুর মৃত্যু হইলে সে এক চীনা সওদাগরের চাকরী গ্রহণ করে। এই গ্রামে তাহার বাড়ী। ক্রমে সে তাহার এক আত্মীয়াকে বিবাহ করিয়া এইখানে এক দোকান খুলে। সে প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। সেই অবধি সে এইখানে আছে। উর্দ্দুভাষী

এইখানে দুই চারি জন আছে বলিয়া সে মাতৃ ভাষা এখনও ভুলে নাই।

এইখানে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি। ভারতের বাহিরে যেখানেই ভারতবাসীর দেখা পাইয়াছি, সেখানেই মনে হইয়াছে, সে আমার বিশেষ আপনার লোক। সে ভারতের যে প্রদেশের লোকই হউক না কেন, ভারতের বাহিরে সে কথা মনে থাকে না। সে সুদূর সীমান্ত, মান্দ্রাজ বা সিন্ধুর লোক হউক না কেন, ভারতের বাহিরে তাহারা সকলেই আমাকে নিজের ভাইয়ের মত গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের বাহিরে ভারতের সব দেশেরই লোক এক হইয়া যায়। উর্দ্দু ভাষাও সেই প্রকার। ভারতের বাহিরে সকলেই এই ভাষা ব্যবহার করে। ইহাতে বেশ জানা যায় যে ইহা আমাদের lingua Indica (ভারতের সাধারণের ভাষা)।

পর দিবস প্রাতে আমি একা তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। নানা প্রকার কথাবার্ত্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম যে, এই স্থানের প্রায়-সাত মাইল দূরে এক সাধু এক পর্ব্বত গুহার মধ্যে বাস করেন। লোকের ধারণা, সাধুর বয়স পাঁচ শত বৎসরের অধিক, তিনি ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন। সাধুর কাহিনী শেষ করিয়া মাধোলাল (আগ্রা নিবাসী সওদাগর) জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইংরাজি পড়িয়াছেন। এ সব কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?" ভামোর চীনা সন্ন্যাসীর কথা আমার বেশ মনে ছিল। আমি

বলিলাম, "কোনও কোনও মানুষের অসাধারণ ক্ষমতা থাকে, ইহা আমি জানি। তবে তোমার এই সাধুর কতদূর ক্ষমতা আছে তাহা নিজে না দেখিয়া বলিতে পারি না। আচ্ছা আমাকে এমন একজন লোক দিতে পার, যে আমাকে ঐ সাধুর আশ্রম দেখাইয়া দেয়?"

মাধোলাল বেশ উৎফুল্লভাবে বলিল, "আপনি যাইবার দিন স্থির করুন, আমি আপনাকে লইয়া যাইব।" স্থির হইল, আগামী কল্য বেলা দুইটার সময় আমি মাধোলালের নিকট আসিব। শুনিলাম এই পাহাড়ী পথে যাতায়াতের জন্য এখানে টাটু ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। আমি তাহাকে চারিটা ঘোড়া প্রস্তুত রাখিতে বলিলাম। আমি জানিতাম আমার বাঙ্গালী সঙ্গী দুইজনও আমার সঙ্গে যাইতে চাহিবেন।

ক্যাম্পে আসিয়া বিপিন ও খগেন বাবুর নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করাতে তাঁহারাও বিশেষ আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মাধোলালের বাড়ী হইতে সন্ন্যাসীর আশ্রম প্রায় সাত মাইল। বেলা আড়াইটার পর রওয়ানা হইয়া আমরা প্রায় সাড়ে চারিটার সময় সাধুর গুহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটি গেরুয়াধারী লোক গুহার ঠিক দ্বারদেশে বসিয়া রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি এক অজ্ঞাত ভাষায় যেন কাহাকে ডাকিলেন। অনতি বিলম্বে আর

এক গেরুয়াধারী যুবক পাশের আর একটি গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদিগকে দেখিয়া নিজের গুহার ভিতর হইতে একখানি কম্বল আনিয়া বিছাইয়া দিল। আমরা সাধু দুই জনকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বসিলাম। প্রথম সাধু আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা পরিচয় দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কি জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। আমি বলিলাম, "আপনার প্রশংসা শুনিয়া আমরা আপনাকে দেখিতে ও কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ দূর করিতে আসিয়াছি।" সাধু বলিলেন, "যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমার যদি জানা থাকে নিশ্চয়ই উত্তর দিব।"

আমি সাধুর সহিত বর্ম্মা ভাষায় কথা কহিতে ছিলাম। সাধুর এই কথায় আমি সঙ্গী দুইজনকে বাঙ্গলা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহাদের কোনও বিশেষ প্রশ্ন আছে কিনা? তাঁহারা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সাধু বাঙ্গলা ভাষায় আমায় বলিলেন, "তুমি যখন প্রথম আমার সহিত আলাপ করিয়াছ তখন তোমারই উচিত প্রথম প্রশ্ন করা।"

আমরা তাঁহার মুখে বাঙ্গলা ভাষা শুনিয়া এমত বিস্মিত হইলাম যে, কি বলিব তাহা ভুলিয়া গেলাম। সাধু হাসিয়া বলিলেন, "আমার বাঙ্গলা ভাষা জানা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আমি বাঙ্গলা দেশে প্রায় দুই বৎসর ছিলাম। তোমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিজয়কৃষ্ণের নিকট আমি অনেক কিছু শিখিয়াছি।" আমি তখন বাঙ্গলা ভাষায় বলিলাম,

"আপনার জন্মস্থানের নাম ও আপনার বয়স কত তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?" সাধু বলিলেন, "এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের নিষেধ আছে" আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঈশ্বরকে কি কেহ দেখিতে পায় ? ঈশ্বরকে দেখিয়াছে, এমন লোক আপনি কি কখনও দেখিয়াছেন ?"

সাধু। দেখ যদি কেহ বলে, সে ঈশ্বর দেখিয়াছে, বুঝিবে সে ঘোর মিথ্যাবাদী। যে একটি শক্তি এই অনন্তে ব্যাপ্ত থাকিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সমস্ত পরিচালনা করিতেছে, তাহাই ঈশ্বর। রেলের ইঞ্জিন যে শক্তি-বলে চলিতেছে তাহা কি কেহ দেখিতে পায় ? তবে তাঁহাকে মন দিয়া অনুভব করা যায়। সেও খুব সীমাবদ্ধ, কারণ আমাদের মনও যে সীমাবদ্ধ। দেখ. ঈশ্বর আছে বা নাই সে বিষয়ে বৃথা সময় নষ্ট করিও না। মনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা কর। এই পথেই চরম উন্নতি লাভ করিতে পার।

আমি। কিন্তু আমাদের জীবনত অতি ক্ষুদ্র। এ অনন্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিব কখন ?

সাধু। তুমি কি মনে কর এই দেহ নাশ হইলেই জীবনের সমস্ত কাজ শেষ হইল ?

আমি। মৃত্যুর পরত আবার এইখানে ফিরিয়া আসিব ও সীমাবদ্ধ মন লইয়া কাজ করিতে হইবে ?

সাধু। তাহা নয়। যদি তুমি ইহ-জীবনে জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা

কর এবং সেই চেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তোমাকে আর ফিরিতে হইবে না।

আমি। ওপারে কি করিব ?

সাধু। সেখানে জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার অবকাশ পাইবে। ওপারে যাহারা জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে তাহারা আরও উর্দ্ধলোকে চলিয়া যায়। এপারে ফিরিয়া তাহারাই আসে যাহারা এ জীবনে শুধু জানোয়ারের মত জীবন যাপন করে।

আমি। আপনি যাহা বলিলেন তাহা যে সত্য তাহা জানিবার কোনও উপায় আছে কি ?

সাধু। জ্ঞানার্জ্জনের জোরে যাহারা স্থায়ীভাবে পরপারে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েক জন আমার বন্ধু আছে। তাহারা প্রয়োজন হইলেই আমার কাছে আসে ও অতীত এবং ভবিষ্যতের অনেক সংবাদ বলিয়া যায়।

আমি। আমাদিগকে কি দয়া করিয়া ওপারের কাহাকেও দেখাইতে পারেন ?

সাধু। পারি, কিন্তু সন্ধ্যার পর।

আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত থাকিতে সম্মত হইলাম। সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব ছিল না। তিনি বলিলেন, "আর ঠিক এক ঘণ্টা পরে দেখাইব। ততক্ষণ তোমরা চা পান কর।" প্রায় চল্লিশ মিনিটের মধ্যে

আমাদের চা ও ধূম পান সমাপ্ত হইল। সাধু চা পান করিলেন কিন্তু ধূম পান করিলেন না।

ঠিক ছয়টার সময় সাধু আমাদিগকে লইয়া তাঁহার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহার মধ্যে একটা তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল বলিয়া আমরা উহার অবস্থা অনেকটা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। গুহাটি ক্ষুদ্র, নয় দশ ফুট লম্বা ও ছয় সাত ফুট চওড়া বলিয়া মনে হইল। উহার ceiling কিন্তু অনুমান বিশ বাইশ ফুট উচ্চ হইবে। একখানা কম্বলের উপর আমরা চারি জনে উপবিষ্ট হইলে সাধু আমাদের নিকট হইতে প্রায় তিন হাত দূরে বসিয়া তাঁহার সেবককে আহ্বান করিলেন। তাহাকে পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞাত ভাষায় কি বলিবার পর সে গুহার এক পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র দ্বার পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে ঐ পথে অন্য গুহায় গেল বা গুহা হইতে বাহির হইয়া গেল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ইহার প্রায় পাঁচ মিনিটের পর (এই সময়টা সাধু নীরব নিস্তব্ধভাবে বসিয়াছিলেন। বোধ হইল যেন ধ্যান করিতেছেন) সাধু আমাদিগকে সেই ক্ষুদ্র পথে অন্য গুহায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম উহা একটি ক্ষুদ্র গুহা। সামান্য কিছু খাদ্য দ্রব্য ও কয়েকটা নিত্য ব্যবহার্য্য বাসন ছাড়া উহার মধ্যে আর কিছুই ছিল না। দেখিলাম, সাধুর সেবক ঐ গুহার এক পাশে বসিয়া আছে—বোধ হইল যেন সমাধি মগ্ন। এই গুহা হইতে বাহির হইতে হইলে সাধুর গুহা ভিন্ন আর কোনও পথ নাই।

আমরা আবার সাধুর গুহায় ফিরিয়া আসিলাম। সাধু বলিলেন, "তোমাদের মনে যাহাতে কোনও সন্দেহ না থাকে সেই জন্য পাশের গুহাটা দেখাইয়া দিলাম। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ যে, পাশের গুহা হইতে বাহির হইবার আমার গুহা ছাড়া আর কোনও পথ নাই। কি ভাবে আমি প্রেতাত্মা দেখাইব তাহা অতি সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ওপার হইতে কোনও আত্মা যদি আসিয়া এপারের কাহাকেও দেখা দিতে বা তাহার সহিত কথা কহিতে চায় তবে তাহাকে কোনও জড়দেহীর নিকট হইতে ক্ষমতা সংগ্রহ করিতে হয়। ওপারের আত্মার সূক্ষ্মদেহ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জড়ময় হইতেছে ততক্ষণ আমরা জড় চক্ষু দ্বারা উহাকে দেখিতে পাইব না। যে আত্মা আসিবে সে আমার সেবকের নিকট হইতে ক্ষমতা লইয়া জড়-দেহ গঠন করিবে। একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তোমরা মনে রাখিবে। প্রেতাত্মা আসিলে তোমরা স্থান ত্যাগ করিয়া তাহার নিকট যাইও না বা তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিও না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি যাহাকে বলিব আপনি তাহাকে আহ্বান করিতে পারেন কি?" "সাধু বলিলেন," না, ইহা সম্ভব নয়। তুমি যাহাকে চাহ সে লোকটা যে পরলোকে আছে তাহার কোনও স্থিরতা নাই—হয়ত সে আবার এখানে আসিয়াছে বা অন্য কোনও লোকে চলিয়া গিয়াছে। এমনও হইতে পারে যে আমার আহ্বান

ওপারে তাহার কানে পঁহুছিল না। এ ব্যাপারে হুকুম চলে না। এইবার তোমরা প্রস্তুত হও।”

সাধু অতি মৃদুস্বরে একটি বাঙ্গলা ভজন গাহিতে লাগিলেন। দুই তিনটি শব্দ অশুদ্ধ উচ্চারিত হইলেও মোটের উপর গানটি নিতান্ত মন্দ হইল না। গানটি শেষ হইবা মাত্র অকস্মাৎ ধূঁয়ার মত কোনও দ্রব্যে সেই গুহা যেন ভরিয়া গেল। ‘ধূঁয়ার মত’ বলিলাম এই জন্য যে তাহা ঠিক ধূঁয়া নয়, কুয়াসাও নয়। খুব গরম লোহার উপর জল ঢালিলে যে প্রকারের ধূম বাহির হয় ইহা অনেকটা সেই ভাবের। বোধ হয় চারি পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে দেখিলাম ঐ ধূঁয়ার মধ্যে একটা ক্ষীণ গোলাকার আলোক পিণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রতি মূহুর্ত্তে ঐ আলোক পিণ্ডের আয়তন বাড়িতে লাগিল। তাহার পর দেখি ঐ ধূঁয়া ও পিণ্ড উভয়ই অদৃশ্য হইয়াছে এবং উহার স্থানে এক মনুষ্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। কি করিয়া যে ঐ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। ইঞ্জিনীয়ার বিপিন বাবু পরে বলিয়াছিলেন যে, ঐ মূর্ত্তি যে সাধুর সেবকের গুহার মধ্য হইতে আসে নাই, ইহা তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। কিন্তু আমার মতে বিপিন বাবু সাধুর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। কারণ ইহার পর আমরা সকলে ঐ সেবকের গুহায় প্রবেশ করিয়া উহার প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করি। সাধুর গুহায় আসিবার পথ ছাড়া উহা হইতে বাহির হইবার

বা প্রবেশ করিবার অপর কোনও পথ ছিল না। এই ঘটনার পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে, আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না যে, সাধু চাতুরী করিয়া আমাদিগকে বেকুব বানাইয়াছিলেন।

মূর্ত্তি প্রকাশ হইবামাত্র দুই হস্ত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল এবং বেশ পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিল "নমস্কার"। তাহার এই একটি কথার উচ্চারণ প্রণালীতে সে যে বাঙ্গালী তাহা আমরা মনে মনে স্বীকার করিলাম। আমরাও প্রতি-নমস্কার করিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নাম কি? বাড়ী কোথায়?" মূর্ত্তি বলিল, "চাটগাঁ।" নাম কেন বলিল না তাহা বুঝিলাম না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি জানেন আমরা কে?" মূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া আমাদের সকলের সম্পূর্ণ সঠিক পরিচয় দিল। এমন কি মাধোলাল যে আগ্রার অধিবাসী তাহা পর্য্যন্ত বলিয়া দিল। আমাদের এই পরিচয়ের মধ্যে সে এমন কয়েকটি সংবাদ দিল যাহা আমরা ছাড়া আর কাহারও পক্ষে জানা একেবারে অসম্ভব। পাঠক মনে রাখিবেন, এ পর্য্যন্ত আমরা সাধুকে আমাদের কোনও প্রকার পরিচয় দিই নাই।

পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কত দিন হইল ওপারে গিয়াছেন?'

মূর্ত্তি। তোমাদের সময়ের হিসাবে আমি সাঁইত্রিশ বৎসর এপারে আসিয়াছি।

আমি। কোন্ লোকের জীবন আপনি ভাল বলেন ; আমাদের পারের, না ওপারের ?

মূর্ত্তি। তোমাদের লোক জড়ময়। সেই জন্য তোমাদিগকে রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির সর্ব্বদাই বশীভূত থাকিতে হয় এবং তাহার জন্য নানা প্রকার অভাব, অভিযোগ তোমাদের লাগিয়াই আছে। আমাদের এ সব উপসর্গ নাই। এপার, ওপার অপেক্ষা লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে তুলনা হয় না। এইবার আমার যাইবার সময় হইয়া আসিল। যাইবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে একটা নূতন সংবাদ দিব। এই ইংরাজি মাসের সতের তারিখে প্রাতঃকাল আটটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত তোমরা নিজের তাঁবু ছাড়িয়া কোথায়ও যাইও না। যদি যাও প্রাণ হানির সম্ভাবনা। আমার শেষ অনুরোধ আমার এই কথা ভুলিও না। (১)

ইহার পর মূহুর্ত্তে দেখিলাম মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়াছে। সে যে পাশের গুহায় প্রবেশ করে নাই ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। মাধোলাল ও খগেন বাবুও এই কথা বলিলেন। কিন্তু বিপিন বাবু এ সম্বন্ধে কোনও মতামত দিলেন না।

(১) পাঠক মনে রাখিবেন, আমরা উপরে মূর্ত্তির মুখে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, সে ঠিক সে ভাষায় কথা বলে নাই। তাহার ভাষায় চাটুগাঁর টান বিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল।

এইবার সতের তারিখের ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এই গ্রামে মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে। সেই উপলক্ষে অনেক বাহিরের লোক গ্রামে উপস্থিত হয়। ঐ সতের তারিখে শুক্রবার পড়াতে আমাদের তিন জন গোরা সৈনিক প্রাতে উঠিয়াই হাটে যায়। কিয়ৎকাল পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সঙ্গের অপরাপর গোরাকে বলে যে, গ্রামের লোকেরা বিনা দোষে তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছে। তাহারা যে মার খাইয়াছে তাহা তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন পোষাক ও অনেক স্থানে রক্তের দাগ দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। অবশ্য অন্যান্য গোরারা তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কালা হইয়া গোরাকে প্রহার! তৎক্ষণাৎ কুড়িজন গোরা (প্রহৃত তিনজন সমেত) তিনটা রিভলভার, তুইটা বর্শা ও অবশিষ্ট সকলে হকিষ্টিক্ লইয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। (পাঠক মনে রাখিবেন, ড্রিলের সময় ছাড়া কোনও সৈনিককে অস্ত্র দেওয়া হয় না।) বিপিন বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল তামাসা দেখিতে সঙ্গে যান। কিন্তু আমি এক প্রকার জোর করিয়া তাঁহাকে যাইতে দিলাম না। পাঠকের মনে থাকিতে পারে সাধুর গুহায় প্রেতাত্মা আমাদিগকে সতের তারিখের প্রাতে তাঁবু ছাড়িতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছিল। তাহা না হইলে আমিও হয়ত বিপিন বাবুর সঙ্গে যাইতাম। এতদিন পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল,

কালার সহিত সংঘর্ষে গোরা চিরদিন অজেয়। সেই জন্য তামাসা দেখিবার জন্য, চাটগাঁ নিবাসী প্রেতাত্মার বিশেষ ভাবে নিষেধ না থাকিলে, আমিও গোরাদের সঙ্গে যাইতাম।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় সংবাদ পাইলাম যে, সেই কুড়ি জন গোরার মধ্যে ছয় জন ছাড়া আর সকলেই নিহত হইয়াছে। তাহারা পলাইয়া প্রাণে বাঁচিয়াছে বটে, কিন্তু বিলক্ষণ জখম হইয়াছে। এইবার বিপিন বাবু বলিলেন, "সে দিন সাধুর গুহায় যদি না যাইতাম তবে আমার চাকরী আজই শেষ হইত। এখন দেখিতেছি ওপারের প্রাণীরা ইচ্ছা করিলে আমাদের যথেষ্ট উপকার করিতে পারে। কিন্তু ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তুমি জিদ্ না করিলে আমি নিশ্চয়ই যাইতাম। অতএব তোমার জন্যই আজ আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।"

ইহার পরও আমাদিগকে ঐ স্থানে প্রায় দেড় মাস কাল থাকিতে হইয়াছিল। আমি সাধুর সহিত আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে একদিনমাত্র তিনি আমাকে আর এক প্রেতাত্মা দেখাইয়াছিলেন। ঐ দিনের আত্মা দক্ষিণ বর্ম্মার অধিবাসী। কথাবার্ত্তা বর্ম্মা ভাষাতে হইয়াছিল। সে বলিল যে, ইহলোকে সে এক জন ফুঙ্গি ছিল। সে প্রায় চল্লিশ বৎসর ওপারে গিয়াছে, কিন্তু এপারে ঠিকভাবে জীবন যাপন করে নাই বলিয়া তাহার ঊর্দ্ধগতি হয় নাই। তবে এখন সে

অনেকটা উন্নতি করিয়াছে বলিয়া তাহাকে আর ফিরিতে হয় নাই। সে বলিল, "অনেককে মৃত্যুর পরই ফিরিয়া আসিতে হয়, অনেকে দুই চারি বৎসর পরে ফেরে, আবার কেহ কেহ একেবারেই ফেরে না। জড় জগতে যে যত ভাল ভাবে জীবন যাপন করে, তাহার পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা ততই কম।" কাহার আদেশে যে এসব স্থির হয় তাহা সে বলিতে পারে না।

(৫)

—):*:(—

নিম্নের ঘটনাটি আমি আমাদের battalion এর সুবেদার সঙ্গ সিংহের মুখে শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স তখন প্রায় বাহান্ন। এই প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ রাজপুত কর্ম্মচারী যে আমাকে এক আষাঢ়ে গল্প শুনাইয়াছিল তাহা আমি মনে করি না।

ঘটনাটা মোটে ছয় বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল (১৮৯৫ খৃঃ) রেঙ্গুণের নিকট পেগু। ইহারই এক গ্রামে ঐ ঘটনা উপলক্ষে পুলিস কেশ হয়, ও পরে আসামীর ফাঁসীর হুকুম হয়। ইহার রেকর্ড নিশ্চয় সরকারী দপ্তরে পাওয়া যাইবে জানিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পেগুর ডিপুটি কমিশনারকে অনুরোধ করি, তিনি যেন দয়া করিয়া আমাকে জানান যে, ঘটনাটা সত্য কিনা। তিনি আমায় যে উত্তর দেন তাহা ইংরাজিতে। নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম।

"আপনি যে ঘটনার কথা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য; আসামী কঠিন শাস্তি পাইয়াছিল। তাহার পুত্র-বধূ তাহাকে ভূতের বেশে দেখা দিয়াছিল বলিয়া পুলিস রিপোর্ট দেয়। এ বিষয়ে কোনও প্রকার মতামত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

এইবার গল্পটা আরম্ভ করি। সাচু গ্রামে বাটু সওদাগর বাস করিত। লোকটা বেশ অর্থশালী। আটান্ন বৎসর বয়সে তাহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে সে তাহার পুত্রের বিবাহ বেশ ধূম-ধামের সহিত সম্পন্ন করিল। পুত্র-বধূ মাবিন্ ঐ গ্রামেরই মেয়ে। সুন্দরী বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। বিবাহের সময় তাহার বয়স ঊনিশ বৎসর। বাটুর ছেলের বয়স কিন্তু তখন ষোল বৎসর। বোধ হয় বয়সের এই পার্থক্যের জন্য পুত্র স্ত্রীকে বড় একটা আমল দিত না। বিবাহের দুই মাস পরে একটা কাজের অছিলায় সে রেঙ্গুণ চলিয়া গেল এবং নানা অজুহাতে বাড়ী আসা বন্ধ করিল।

পুত্র চলিয়া যাইবার পর বাটু পুত্রবধূর নিকট একটা কুৎসিত প্রস্তাব করিল। মাবিন্ শুধু যে অসম্মতি জানাইল তাহা নয়। সে শ্বশুরকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিল এবং শেষে বলিল যে, সে তাহার গুণের কথা গ্রামের সকলকে বলিয়া দিবে। ঐ দিনেই রাত্রি প্রায় এগারটার সময় গ্রামের লোক সভয়ে শুনিল যে মাবিন্ আত্মহত্যা করিয়াছে। দেখা গেল একখানা বড় ছোরা তাহার মৃতদেহের বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পুলিসকে সংবাদ দেওয়া হইল। আত্মহত্যার রিপোর্ট দেওয়াতে (মোটা দক্ষিণার সহিত) লাস পর দিবস দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই জ্বালাইয়া দেওয়া হইল।

ঐ দিনই রাত্রি প্রায় দুইটার সময় বাটুর শয়ন কক্ষ হইতে অতি ভীষণ চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া সকলে যাইয়া দেখে,

কামরা ভিতর হইতে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু কক্ষের ভিতর হইতে যন্ত্রণা সূচক গোঁ গোঁ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা গেল না বা কেহ দ্বার খুলিল না। তখন দরজা ভাঙ্গিয়া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে বাটু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। বহুক্ষণ পরে যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে বলিল, "রাত্রে মাবিন্ আমার নিকট আসিয়াছিল। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ ও রক্তমাখা চেহারা অবিকল সেই ভাবেই ছিল, যেমনটি মৃত্যুর পর তোমরা দেখিয়াছিলে।"

মাবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ যে বাটু, সে সন্দেহ অনেকের ছিল। এই ঘটনায় ঐ সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। বিশেষ ইহার পর ক্রমাগত চারি রাত্রি ধরিয়া যখন ঐ মূর্ত্তি বাটুকে দেখা দিল, তখন অধিকাংশ লোকের এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

ষষ্ঠ দিনে সকলে শুনিল যে বাটু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে বলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সব ঘটনায় লোকে বিশেষ বিস্মিত হইল না, বরং সন্তুষ্টই হইল যে উহার মত লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

বাটুর গ্রামের প্রায় ষাট মাইল দূরে লুংটা গ্রাম। গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র—লোক-সংখ্যা সাতাশ আঠাশ জনের অধিক হইবে না। গ্রামের এক প্রান্তে একটি ফুঙ্গি-চাঙ। উহার অধিকারী ফুঙ্গি মহাশয় অতি বৃদ্ধ—বয়স প্রায় বিরাশী তিরাশী। এক দিন প্রাতে বাটু অতি দীনবেশে এই মঠে

উপস্থিত হইল এবং ফুঙ্গিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কর-জোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বাটু অত্যন্ত অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমি সংসারে বড় যন্ত্রণা পাইয়া আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি। আমাকে আশ্রয় দিন—তাহা নহিলে আমি এইখানে অনাহারে মরিব।"

দৈবসংযোগে ফুঙ্গির একমাত্র শিষ্য উহার দুই দিন পূর্ব্বে চলিয়া যায়। এই বয়সে মঠের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে বিলক্ষণ কষ্ট সাধ্য মনে হইতেছিল। এ সময় বাটুর আগমন যেন ভগবানের দান বলিয়া মনে হইল। অবিলম্বে ফুঙ্গি তাহাকে শিষ্যের পদে বহাল করিলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যারতির পর তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার নূতন শিষ্য মঠের দেবতার (বুদ্ধ মূর্ত্তি) কক্ষে শয়ন করিবে, তিনি বিশেষ বিস্মিত হইলেন। দেবতার কক্ষ অতি পবিত্র স্থান। সেখানে যে কেহ রাত্রিবাস করিতে চায় ইহা তিনি কখনও শুনেন নাই। ফুঙ্গি তাহাকে এই অদ্ভুত প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "একটা প্রেতাত্মা আমাকে প্রত্যহ রাত্রে দেখা দেয় ও বিরক্ত করে। আমার বিশ্বাস দেবতার গৃহে আশ্রয় লইলে সে আসিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আজ আর এ সম্বন্ধে তোমায় অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিব না। কিন্তু বোধ হইতেছে তুমি

কোনও মহাপাপ করিয়াছ। দেবতার ঘরে আমি তোমায় স্থান দিতে পারি না। ঐ পবিত্র স্থানে তুমি আশ্রয় লইলে, উহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে। তবে আমি এমন উপায় করিতে পারি, যাহাতে ঐ প্রেতাত্মা তোমার কক্ষে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু তোমার পাপ যদি অত্যন্ত গুরুতর হয়, বিশেষ ফল হইবে মনে হয় না। এখন হইতে রাত্রি সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত নিজের কক্ষে বসিয়া এক মনে ভগবানের নাম জপ করিতে থাক। যদি একাগ্রমনে জপ করিতে পার খুব সম্ভব সুফল হইবে।"

রাত্রি প্রায় বারটার পর বৃদ্ধ ফুঙ্গি বাটুর কক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কক্ষের সম্মুখে সাড়ে তিন ফুট রাস্তা। উহার উভয় পার্শ্বে কয়েকটি করিয়া কাম্‌রা। দক্ষিণ দিকের প্রথম কক্ষে বৃদ্ধ থাকিতেন। বাম দিকের তৃতীয় বা সর্ব্ব-শেষ কক্ষে নূতন শিষ্য বাটু বাস করিত। বৃদ্ধ ঐ পথের উপর দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ পনের মিনিট পরে তিনি দেখিলেন একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি ঐ রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করিল। বার্দ্ধক্য বশতঃ তাঁহার দৃষ্টি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি রমণীর চেহারা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। মূর্ত্তি কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। সন্ধ্যার পর স্ত্রীলোকের পক্ষে আশ্রমে প্রবেশ নিষেধ তাহা সকলেই জানিত। তথাপি রমণী মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া ফুঙ্গি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মঠের

মালিক নিকটেই দাঁড়াইয়া, সে কিন্তু কোনও প্রকার দ্বিধা না করিয়া বৃদ্ধের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ প্রথমে ভাবিয়াছিল এ কোনও নষ্টা স্ত্রীলোক। রাত্রে তাঁহার নূতন শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সে যখন ঠিক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তিনি সভয়ে দেখিলেন যে মূর্ত্তির বুকে একখানা ছোরা আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত। তাঁহার মনে হইল রক্ত যেন তখনও ক্ষতের মুখ হইতে বাহির হইতেছে।

মূর্ত্তির চেহারা ও ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন এ অন্য জগতের জীব। বিশেষ এত বড় ছোরা বুকের মধ্যে আমূল পূরিয়া যে অনায়াসে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে, সে মর জগত অতিক্রম করিয়াছে। তিনি দেখিলেন ঐ নারী মূর্ত্তি বাটুর কক্ষ-দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। তখন তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ভগবান তথাগতের দোহাই। তুমি কে? এখানে কেন আসিয়াছ?" পর মূহুর্ত্তে দেখিলেন মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পর দিবস প্রাতে গুরু-শিষ্যে সাক্ষাৎ হইলে, বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কি প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলে?" বাটু বেশ প্রফুল্ল ভাবে বলিল, "না"।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আচ্ছা ঐ স্ত্রীলোক তোমার কে, কত দিন পূর্ব্বে ও কেন তাহাকে হত্যা করিয়া-

ছিলে?" ভীষণ আতঙ্কে বাটুর সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং সে বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বোধ হয় সে সাধ্যমত নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিল, পরে বলিল, "আপনি কেমন করিয়া আমার লুকান কথা জানিতে পারিলেন? আমিত আপনাকে কোনও কথা বলি নাই। তবে কেমন করিয়া"—তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ ফুঙ্গি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের কক্ষে লইয়া গেলেন এবং কহিলেন, "তোমার সব কথা আমাকে বলিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধ হইলে তোমাকে রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন পাপ হইতে মুক্ত হইবার আর কোনও উপায় নাই। অবশ্য তুমি যদি ইচ্ছা না কর আমাকে কিছুই বলিও না। কিন্তু তাহা হইলে তোমাকে আজই এই মঠ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিও তুমি যেখানেই যাও ঐ প্রেতাত্মা তোমার সঙ্গ ছাড়িবে না।"

বাটু আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি সমস্ত শাস্তি গ্রহণ করিব, কিন্তু ঐ প্রেতের হাত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। উহার জন্য আমার জীবন অসহ্য হইয়াছে।" তাহার পর সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "ঐ রমণী আমার পুত্রবধূ ছিল। এ বয়সে বিবাহ করিলে লোকে উপহাস করিবে ভাবিয়া আমি আমার বালক পুত্রের সহিত ঐ যুবতীর বিবাহ দিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল আমি নিজে উহাকে ভোগ

করিব। বিবাহের পর কিন্তু দেখিলাম, সে আমার প্রস্তাবে অসম্মত। তখন এক দিন সুযোগ বুঝিয়া আমি জোর করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলাম। সঙ্গে একখানা বড় ছোরা লইয়া গিয়াছিলাম—উদ্দেশ্য ছিল যে, ছোরার ভয়ে সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্তু ছোরার ভয়েও সে যখন রাজি হইল না তখন ছোরাখানা একদিকে ফেলিয়া দিলাম ও তাহাকে সবলে চাপিয়া ধরিলাম * * *। আমার কবল হইতে মুক্ত হইয়াই সে ছুটিয়া গিয়া ঐ ছোরাখানা উঠাইয়া লইল এবং চক্ষুর নিমিষে তাহা নিজের বুকে বসাইয়া দিল। আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

ইহার পর বাটু পুলিসে আত্মসমর্পণ করিল ও বিচারে তাহার চরম শাস্তি হইল। শুনিলাম, তাহার পুত্রবধূ প্রত্যহ গভীর রাত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। জেলে যাইবার একমাসের মধ্যেই সে ঘোর উন্মাদ হইয়া গেল। একদিন সুযোগ পাইয়া সে একখানা দা সংগ্রহ করিল এবং আত্মহত্যা করিয়া তাহার হিসাব মতে সমস্ত যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার যুক্ত প্রদেশের (U. P.) অভিজ্ঞতা

আমাদের দেশের সে কালের ত্রিকালদর্শী মুনি ঋষিরা এবং এ কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাহার জড়দেহের অতিরিক্ত এমন একটা জিনিস আছে যাহার বিনাশ নাই এবং যাহাকে আমরা 'আত্মা' নামে অভিহিত করি।

আমি এই পরিচ্ছেদে এমন কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করিব যাহাতে পাঠক ও পাঠিকা দেখিবেন যে আত্মা আমাদের জড়দেহে থাকে বটে, কিন্তু দেহের সহিত উহার আকাশ পাতাল প্রভেদ। যোগদর্শনে এমন প্রণালী আছে যাহা দ্বারা মানুষ নিজের আত্মা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দেহ হইতে মুক্ত করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে। যে সময়ে আত্মা এইভাবে দেহের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন দেহের অবস্থা অবিকল মৃতদেহের মত হয়। এই প্রকারের ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং হয়ত আরও অনেকে দেখিয়াছেন। এই সকল কাহিনীর মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। এই বিশাল জগতে এমন অনেক কিছু সংঘটিত হয়, যাহা শুনিলে অসম্ভব

বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যদি কাহারও ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিজয়কৃষ্ণ, বাবা গম্ভীরনাথ প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে জানিবার সৌভাগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, আমরা যাহা অসম্ভব মনে করি, উহা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার।

এই পুস্তক ছাপিবার সময় হরিদ্বারে শিবানন্দ সরস্বতী নামক একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন (১৯৪১ খৃঃ) তিনি স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করেন। তিনি যে মহাপ্রস্থান করিবেন, ইহা তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে ছয়দিন পূর্ব্বে বলিয়া দেন। ঘটনার দিন তিনি গঙ্গার তীরে বসিয়া সকলের সম্মুখে দেহরক্ষা করেন। তিনি যে আত্মাকে দেহ হইতে মুক্ত করিয়া ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন, ইহা অনেকেই জ্ঞাত ছিল।

দেহ হইতে আত্মা বিমুক্ত হইলে আত্মার কার্য্যশক্তি সম্পূর্ণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু দেহ মড়ার মত পড়িয়া থাকে। উহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, আমরা যাহাকে 'মন' বলি তাহা আত্মারই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। মন আত্মাতেই থাকে, আত্মাহীন দেহে থাকিতে পারে না।

—)ঃ*ঃ(—

সে কালে কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী নামক একজন প্রসিদ্ধ যোগী ও সিদ্ধ পুরুষ বাস করিতেন। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, অথচ লোকে বলিত তিনি সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিদ ও ত্রিকালদর্শী। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর তাঁহার এক জন বিশেষ ভক্ত ছিলেন ও প্রত্যেক সপ্তাহে অনধিক দুই দিন তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন। স্বামীজির বিষয়ে নিম্নলিখিত কাহিনী পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম। ইহার পর কাশীর সেকালের সুবিখ্যাত রাজা শিবপ্রসাদ এবং একালের ভারত বিখ্যাত বাবু ভগবান দাস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ কাহিনীটি বর্ণে বর্ণে সত্য।

স্বামিজী সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকিতেন এবং অনেক সময় সহরেও ঐ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাকে সকলে ভাল করিয়া জানিত বলিয়া কোনও দিন কেহ আপত্তি করে নাই। সে সময়ে Mr Smithson কাশীর বড় সাহেব (Collector)। তিনি মনে করিতেন ভারতের সব লোকই অসভ্য ও অশিক্ষিত। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া কয়েক জন পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত প্রাতে সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, নগ্ন দেহে, নগ্ন শিরে এবং নগ্নপদে

ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসিয়া আছেন। সাহেব এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সঙ্গের পুলিস সাহেবকে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অসভ্যটাকে জান কি?" তাঁহার সঙ্গের পুলিস কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন দেশীয় বলিল, "হুজুর, ইনি একজন হিন্দু সাধু।" সাহেব অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোমরা এমন জানোয়ারকে এ ভাবে সহরে কেন আসিতে দাও? ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিবে। আর এখনই ইহাকে হাজতে পাঠাইয়া দাও। কাল ইহার বিচার হইবে।" সাহেব পুলিস কর্ম্মচারীও স্বামিজীকে জানিতেন। তিনি বলিলেন, "আজ ইহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দিলে হয় না? হিন্দুরা ইহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।" বড় সাহেব শুধু "না" বলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। তখন প্রায় বেলা দশটা।

ঐ দিন বেলা প্রায় চারিটার সময় বড় সাহেব নিজের বাংলার সম্মুখের উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সঙ্গে প্রাতের সেই সাহেব পুলিস কর্ম্মচারী। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, ঐ বাগানের মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে আন্দাজ সাত আট গজ দূরে স্বামীজি একটা বৃক্ষের নীচে পূর্ব্ববৎ উলঙ্গবেশে বসিয়া আছেন। সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। ইহাকে প্রাতে হাজতে পাঠান হইয়াছে। তবে এখানে কেমন করিয়া আসিল! তাঁহার নিকট এ সময় যদি একজন দেশী কর্ম্মচারী থাকিত তিনি কি করিতেন বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা না থাকাতে

উদ্যত ক্রোধকে যথাসাধ্য দমন করিয়া পুলিস সাহেবকে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনিত জানেন ইহাকে আমি আজ প্রাতে হাজতে পাঠাইয়াছিলাম। কে ইহাকে ছাড়িল?" সাহেব কর্ম্মচারীও স্বামীজিকে ঐ স্থানে দেখিয়া যথেষ্ট বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি নিজে আজ ইহাকে হাজতে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস হাজতের কোনও হিন্দু কর্ম্মচারী ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি এখনই হাজতে গিয়া সংবাদ আনিতেছি।"

কলেক্টর্ সাহেব বলিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কিন্তু ইহাকে ছাড়া হইবে না। ইহাকে সঙ্গে লইয়া চল। লোকটা ভয়ানক বেয়াদব—ছাড়া পাইয়া প্রথমেই আমার বাংলায় আসিয়াছে। উহার উদ্দেশ্য আমাকে দেখান যে সে আমায় গ্রাহ্য করে না। তুমি দুইজন সিপাহী ডাক। তাহারা ইহাকে হাজতে লইয়া চলুক।"

কলেক্টর্ ও পুলিস কর্ম্মচারী অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন সিপাহীর মধ্যে স্বামীজি চলিলেন। স্বামীজিকে সিপাহীরা চিনিত বলিয়া তাঁহার অঙ্গে কেহ হাত দিল না।

বড় সাহেবের বাংলার নিকটেই হাজত। তাঁহারা অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। হাজতের প্রধান কর্ম্মচারী হামিদ আলি মহাশয় একখানা চারপায়ে অর্দ্ধ শায়িতভাবে সট্‌কায় 'পরম আরামের সহিত ধূমপান করিতেছিলেন।

এ প্রকার অসময়ে কলেক্টরের আসা অসম্ভব বলিয়াই তিনি জানিতেন। কলেক্টরের দল একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়াতে তিনি হতবুদ্ধিভাবে এক লম্ফে চারপায় ত্যাগ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ নিজের ফর্‌সির উপর পড়িলেন। * * * *

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে বড় সাহেবের মেজাজ যখন কতকটা শান্ত হইল, তিনি স্বামীজিকে দেখাইয়া হামিদ আলিকে বলিলেন, "ইহাকে চেন?" বেচারার বুদ্ধি বোধ হয় তখনও ঠিক স্থানে আসে নাই। সে সাহেবের প্রশ্নে বেকুবের মত চাহিয়া রহিল মাত্র, কোনও উত্তর দিল না। তখন সাহেব কি একটা কড়া কথা বলিতে যাইতেছিলেন। পুলিস সাহেব তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিবারণ করিয়া হাজত কর্ম্মচারীর নিকট আসিলেন এবং বেশ মোলায়েম ভাবে বলিলেন, "আজ প্রাতে আমি একজন হিন্দু সাধুকে তোমার নিকট লইয়া আসি এবং তাহাকে হাজতে রাখিবার হুকুম দিই। এ কথা তোমার মনে আছে?"

কর্ম্মচারী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলে, পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই সাধুকে তুমি দেখিলে চিনিতে পার?" হাজত কর্ম্মচারী বলিল, "হাঁ হুজুর, চিনিতে পারি বৈ কি।" পুলিস সাহেব তখন স্বামীজিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে জান?"

স্বামীজিকে দেখিয়া হাজত কর্ম্মচারীর মুখ শুখাইয়া গেল।

সে জড়িত স্বরে বলিল, "ইহাকেত আমি নিজে হাজতে বন্ধ করিয়াছিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় আমি নিজে ইহাঁকে খাদ্য দ্রব্য দিবার জন্য ইহাঁর কুঠরীতে গিয়াছিলাম। তখনও আমি ইহাঁকে দেখিয়াছি। কে ইহাঁকে ছাড়িয়া দিল? হুজুর, আমি এঘটনার কিছুই জানি না। হাজতের কোন সিপাহী নিশ্চয়ই ইহাঁকে ছাড়িয়া দিয়াছে।"

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়েদখানার চাবি কাহার কাছে থাকে?" হাজত কর্ম্মচারী পকেট হইতে এক-গোছা চাবি বাহির করিয়া বলিল, "হুজুর, সব চাবি আমার কাছে থাকে। আমি নিজে খুলি নিজে বন্ধ করি।"

এই সময় কলেক্টর সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, চল। এই লোকটা যে কামরায় বন্ধ ছিল, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিব।" তিনি অগ্রসর হইলেন। আর আর সকলে তাঁহাকে অনুসরণ করিল। হাজত কর্ম্মচারী বলিদানের ছাগের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। সে জানিত যে, সাহেব যাইয়া দেখিবে যে, সাধুর কামরা খোলা। চাবি যখন তাহার কাছে থাকে, তখন স্বামীজির পলায়নের জন্য সাহেব তাহাকেই দায়ী করিবেন। সাহেব যে প্রকার চটিয়াছেন তাহাতে আজই তাহার চাকরী শেষ। ইহার উপর জেল হওয়াও বিচিত্র নয়।

হাজত কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ মত সকলে যখন একটি কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখা গেল কক্ষে তালা লাগান। পুলিস সাহেব বলিলেন, "তুমি বলিতেছ

চাবি তোমার কাছে থাকে। তবে কয়েদি কেমন করিয়া পলাইল? এ ঘরে দেখিতেছি চব্‌সের তালা লাগান। তুমি জ্ঞান বোধ হয় এ তালার নকল চাবি হয় না।"

হাজত কর্ম্মচারী বলিল, "আমি এ ঘটনার কিছুই জানি না। আমি ঈশ্বরের নাম লইয়া—"। তাহাকে বাধা দিয়া বড় সাহেব বলিলেন, "বস্ বস্ আর শুনিতে চাই না। এই ঘরের চাবিটা আমায় দাও।"

সাহেব চাবি লইয়া প্রথমে ঘরের তালাটা বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর উহা খুলিয়া ফেলিলেন। দ্বার উন্মুক্ত করিয়াই একটা কুৎসিৎ দিব্য উচ্চারণ করিয়া তিনি চারি পাঁচ পদ পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। পুলিস সাহেব তাঁহার পাশেই ছিলেন: তিনি বলিয়া উঠিলেন, "Who the devil is in this room? He seems to be the Sadhu!! ("কামরায় এ সয়তান কে? ইহাকে ঐ সাধু বলিয়া মনে হইতেছে!!")

তখন বাহিরের স্বামীজিকে কক্ষের ভিতরে আনিয়া অন্দরের স্বামীজির পাশে দাঁড় করান হইল। সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল যে উভয় স্বামীজি একই লোক! ইহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না!!

দেখা গেল ঘরের ভিতরকার সন্ন্যাসী পদ্মাসনে বসিয়া ধ্যান-মগ্ন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত। বোধ হইল তিনি চেতনা শূন্য। সকলে যখন নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধভাবে এই অদ্ভুত

ব্যাপার দেখিতেছিল, তখন হঠাৎ বড় সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "আরে, দ্বিতীয় স্বামী কোথায় গেল ?"

সত্যই তাই। দ্বিতীয় স্বামী যে কখন কি ভাবে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা কেহই দেখে নাই, অথচ উভয়ে পাশাপাশি ছিল—একজন বসিয়া ও অপর জন দাঁড়াইয়া। ইহার পর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বড় সাহেব অস্ফুট স্বরে পুলিস সাহেবকে বলিলেন, "এই ধরণের কাহিনী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। এই জগতে দেখিতেছি এমন অনেক জিনিস আছে যাহা আমাদের জ্ঞানের অতীত। এই সাধুকে ছাড়িয়া দাও।"

তিনি হিন্দুদিগকে অসভ্য বলিয়াই মনে করিতেন। এই ঘটনার পর তাঁহার মত বদলাইয়াছিল কি-না তাহা আমরা বলিতে পারি না।

উপরোক্ত ঘটনায় আমাদের মহাভারতের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। মহাযুদ্ধের পর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বেদব্যাসকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁহার মৃত আত্মীয়গণকে সশরীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন এবং তিনি যাহাতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পা'ন তাহার উপায় করেন। মহামুনি বেদব্যাস অন্ধের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

এই গল্প কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেই প্রাচীন যুগেও লোকে বিশ্বাস করিত যে পরলোকগত আত্মাকে পুনরায় ইহলোকে আহ্বান করা যায়।

আমার মতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কার্য্য বেদব্যাসের অপেক্ষাও দুরূহ। যাহারা পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন আজ কাল য়ুরোপ ও আমেরিকায় পরলোক হইতে আত্মাকে আহ্বান করা প্রায় সাধারণ ব্যাপারের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত কাজ সেকালে কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। (১)

(১) উপরোক্ত কাহিনীটি যখন পিতাঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম, তখন আমি কলেজের ছাত্র। বোধ হয় তখন সেই জন্য আমি উহা অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। ইহার চারি পাঁচ বৎসর পরে যখন রাজা শিবপ্রসাদ এবং বাবু ভগবান দাস উহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তখন সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মনের নিভৃত কোণে সামান্য একটু সন্দেহ যে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল না তাহা বলিতে পারি না।

ইহার পর আমি যখন বাবা গম্ভীর নাথের অলৌকিক কাজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম তখন আমি বুঝিলাম, কোনও ব্যাপার আমি দেখি নাই বলিয়া উহা যে অসম্ভব ইহা মনে করা অন্যায়।

বাবা গম্ভীর নাথের কাহিনীটি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

—):*:(—

নিম্নলিখিত কাহিনী অনেকটা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ঘটনার মত, প্রভেদ এই যে ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স সাতাশ বৎসর। যদিও ঘটনাটা আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিজে দেখিয়াছিলাম, তথাপি সে সময় মনে হইয়াছিল যে, ইহার মধ্যে এমন একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে যাহা আমার বুদ্ধির অতীত। এই কাহিনীর আর একজন সাক্ষী রায় সাহেব অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়, গোরক্ষ-পুরের সরকারী জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

আমি তখন গোরক্ষপুরে। ঐ সহরের গোরক্ষনাথ মহাদেব দেশ প্রসিদ্ধ। সে সময়ে দেবতার মন্দির সংলগ্ন একটি ছোট কাম্‌রায় বাবা গম্ভীরনাথ নামক একজন সন্ন্যাসী থাকিতেন। লোকের বিশ্বাস তিনি সিদ্ধপুরুষ। বহুদূর হইতে লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। পূর্ব্বোক্ত অঘোর বাবু ইহাঁর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ইনি প্রায়ই অপরাহ্ণে ইহাঁকে দর্শন করিতে যাইতেন। আমি অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম।

বাবা অত্যন্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। সেই জন্য আমার ইহাঁর উপর খুব বেশী ভক্তি ছিল না। আমি বর্ম্মায় যে

প্রকারের সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের যে রকম অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহা আমি ভুলি নাই। এ পর্য্যন্ত আমি বাবার মধ্যে এমন কোনও ক্ষমতা বা বিদ্যা দেখি নাই যাহাতে তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে পারি। অঘোর বাবু কিন্তু প্রায়ই বলিতেন যে, বাবা সিদ্ধপুরুষ—প্রয়োজন হইলে এমন কাজ করিতে পারেন যাহা লোকে অসম্ভব মনে করে। আমি প্রায়ই ইহার জবাব দিতাম না, কারণ আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতাম না।

একদিন আমরা বাবার সম্মুখে বসিয়া বাঙ্গলা ভাষায় আত্মার বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছিলাম। বাবা অদূরে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। অঘোর বাবুর কথার জবাবে আমি বলিলাম, "শুনিয়াছি বটে, কেহ কেহ আত্মাকে জড়দেহ হইতে বাহির করিয়া ইচ্ছামত নানা প্রকার অসম্ভব কাজকেও সম্ভব করিয়া দেন।" তাহার পর আমি তাঁহাকে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিলাম, এ ঘটনা পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

এই সময় বাবা হিন্দী ভাষায় বলিলেন, "যে স্বামীজির গল্প আপনি শুনাইলেন, তাঁহার মত সিদ্ধ-মহাপুরুষ এ দেশে আর ছিল না, বোধ হয় আর হইবেও না। সাহেবকে একটু শিক্ষা দিবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা

তাঁহার পক্ষে অতি সহজ কার্য্য। আমার যৌবনকালে আমি আট বৎসর তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলাম, ঐ সময় তিনি এমন কয়েকটি কাজ করিয়াছিলেন যাহা তোমরা 'অসম্ভব' বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার। কিন্তু আমি তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহারা ইংরাজি পড়িয়াছে তাহারা এই সকল কথা প্রায়ই বিশ্বাস করে না। কারণ এই যে, ইহা ইংরাজি পুস্তকে নাই। নাই এই জন্য যে, ইংরাজরা এ সমস্ত বিদ্যার কখনও চর্চ্চা করে নাই, সেই-জন্য ইহা তাহাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাহিরে। আমাদের দেশে এক সময় ইহার যথেষ্ট চর্চ্চা হইত, সেই জন্য এখনও পর্য্যন্ত এই বিদ্যা অনেকে জানে। কিন্তু যে ভাবে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার বাড়িতেছে, ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের দেশের লোকও এই সকল বিদ্যা ভুলিয়া যাইবে।"

আমি প্রায় দুই বৎসর কাল গোরক্ষপুরে আছি। ইহার মধ্যে বহুবার বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে একত্রে এত কথা বলিতে আমি কখনও শুনি নাই। অঘোর বাবুও তাহাই বলিলেন।

ইহার আট দশ দিন পরে একদিন বুধবার অপরাহ্ণে আমি ও অঘোর বাবু স্কুল হাতার (Compound) ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এমন সময় অকস্মাৎ কেন বলিতে পারি না আমার খেয়াল হইল যে একবার বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। অঘোর বাবুকে এই খেয়ালের কথা বলাতে

তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন, "বড় আশ্চর্য্য ব্যাপারত! ঠিক এই ইচ্ছা আমারও হইয়াছে। চল এখনই যাওয়া যাক্।" আজ পর্য্যন্ত বাবার নিকট আমরা গাড়ী করিয়া যাই নাই। আজ কিন্তু আমরা যাইবার জন্য এ প্রকার ব্যস্ত হইয়াছিলাম যে তখনই একখানি গাড়ী ডাকাইয়া আমরা অবিলম্বে বাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বাবা একা নিজের কক্ষের সম্মুখের ছোট বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে এখানে আসিবার যে আহ্বান পাঠাইয়াছিলাম তাহা কি তোমরা পাইয়াছিলে?"

আমি বিস্মিত ভাবে বলিলাম, "কই আপনার কোনও লোকত যায় নাই।" বাবা হাসিয়া বলিলেন, "তবে আসিলে কেন? তোমরা ত স্কুলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে।"

আমি। আমাদের হঠাৎ আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হওয়াতে আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাবা। ঐ ইচ্ছাটাই আমার মানসিক আহ্বান। যদি কাহাকেও সমস্ত প্রাণ দিয়া মনে মনে আহ্বান করা যায়, সে ডাক নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবে। অবশ্য এ ভাবে ডাকিবার নিয়ম-প্রণালী আছে।

অঘোর বাবু। আমরা স্কুলে বেড়াইতেছিলাম তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

ঠিক ঐ সময় দুইজন স্ত্রীলোক বাবার নিকট উপস্থিত

হওয়াতে অঘোর বাবুর প্রশ্নের জবাব আর শোনা হইল না। উঁহাদের মধ্যে একজন বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের রমণী বলিয়া মনে হইল—বয়স অনুমান ষাট বৎসর। অপরা হয়ত তাঁহার দাসী। উহাঁরা বসিলে বাবা বলিলেন, "আপনারা যে কাজের জন্য আসিয়াছেন স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন। এই বাবুরা আছেন বলিয়া সঙ্কোচ করিবেন না।" বৃদ্ধা তখন যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্যারিস্টারী পড়িতে বিলাত গিয়াছে। বরাবর পত্রাদি দিত। কিন্তু প্রায় চারিমাস হইতে সে পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। কয়েকবার পত্র দিয়া উত্তর না পাওয়াতে বৃদ্ধা তাহার পুত্রের এক বন্ধুকে বিলাতে তার পাঠান। অদ্য ঐ তারের উত্তর আসিয়াছে। তাঁহার পুত্র বিলাতে নাই। সে কোথায় তাহার বন্ধু জানে না।

এই কাহিনী শুনাইয়া বৃদ্ধা হঠাৎ বাবার দুই পা' জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "বাবা, আমাকে দয়া করিতে হইবে! আমাকে শুধু বলিয়া দিন আমার ছেলে বাঁচিয়া আছে কি না। আমি আর কিছুই চাই না।"

বাবা বিশেষ চেষ্টার পর নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিলেন, "আমি দরিদ্র সংসার-ত্যাগী লোক, বিলাতের সংবাদ কি জানি?" বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি জানি, আপনি ইচ্ছা করিলেই আমার ছেলের সংবাদ আনিতে পারেন। ভগবান গোরক্ষ-নাথের দোহাই, আমাকে দয়া করুন।"

এইবার বাবা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখি আমি কি করিতে পারি।". তাহার পর আমাদিগকে বলিলেন, "আমি কিছুক্ষণের জন্য আমার কুটীরে যাইতেছি। যতক্ষণ আমি বাহির হইয়া না আসি তোমরা যাইও না, বা আমার কুটীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিও না।" তিনি নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

আমি অঘোর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কিছু বুঝিলেন কি? এই ব্যাপারে বাবা কি সাহায্য করিতে পারেন? আপনি কি মনে করেন ইনি প্রকৃতই বৃদ্ধাকে উহার ছেলের সংবাদ আনিয়া দিতে পারেন?"

অঘোর বাবু বলিলেন, "এখন এ প্রশ্নে কি ফল? দেখই না ইহার শেষ পরিণতি কি হয়।" আমি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যে এই ব্যাপারে বাবার দ্বারা বৃদ্ধার বিশেষ কোনও উপকার হইবে। হয়ত বাবা বলিবেন, আমি গণনা দ্বারা দেখিলাম, বৃদ্ধার ছেলে শীঘ্র ফিরিবে না।

যাহা হউক, প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে বাবা বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যে, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত। বহুক্ষণ ব্যাপী কঠিন পরিশ্রম করিলে লোকের চেহারা যেমন হয়, ইহাও অনেকটা সেই ভাবের। বাবা আসন গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "আজ বুধবার। এই সাম্নের সোমবারে তোমার পুত্র খুব সম্ভব গোরক্ষপুরে উপস্থিত হইবে। এখন সে জাহাজে বিলাত হইতে আসিতেছে।"

বৃদ্ধার দেখিলাম বাবার উপর অসীম বিশ্বাস। সে বিনা প্রতিবাদে বাবার ঐ আজগুবি সংবাদ শুনিল এবং তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। আমি কিন্তু থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "বাবা, জাহাজখানা এখন কোথায়?"

বাবা হাসিয়া বলিলেন; "ইংরাজী শিক্ষায় তোমার মন এমন হইয়া গিয়াছে যে, যে জিনিস তুমি স্বচক্ষে না দেখিবে তুমি বিশ্বাস করিবে না। অথচ আমি আজ ঐ বৃদ্ধার জন্য যাহা করিলাম, তাহা এ দেশে খুব অসাধারণ নয়। ইহা যোগের কথা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহার চর্চ্চা করেন নাই, সেই জন্য তাঁহারা ইহা জানেন না। ঐ পণ্ডিতদের কিন্তু একটা বিশেষ দোষ আছে। তাঁহারা ভাবেন যে যাহা তাঁহারা জানেন না, তাহা নাই। তুমিও এই অপগুণটি পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছ। তুমি অঘোর বাবুর বিশেষ বন্ধু। সেই জন্য আমার বিশেষ ইচ্ছা, তোমার মনের এই ভাব চলিয়া যায়। এই প্রকার ঘটনা তোমার স্বচক্ষে দেখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেই জন্যই আজ আমি তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। আমি জানি তোমার এ মনোভাব শীঘ্রই যাইবে।"

পরের বুধবারে অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় অঘোর বাবু আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার বাংলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একজন সাহেবি পোষাক পরিহিত

হিন্দুস্থানী যুবক তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া অঘোর বাবু বাঙ্গলা ভাষায় বলিলেন, "ইনি সেই বৃদ্ধার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র। বাবার কথামত ইনি পরশু এখানে আসিয়াছেন। বাবার সহিত ইহাঁর মায়ের সাক্ষাতের কোনও কথা ইনি এখনও জানেন না। আমি ইহাঁকে ও তোমাকে এখনই বাবার নিকট লইয়া যাইব। বাবাকে আমি মহামানব মনে করি। আমার এ বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, আজ তোমার বহুদিনকার একটা কু-সংস্কারের মুলোচ্ছেদ হইবে।"

পথি মধ্যে গাড়ীতে অঘোর বাবু যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা গম্ভীর নাথের সহিত তোমার আলাপ পরিচয় আছে?" সদ্য বিলাত ফেরত লোকটি যেন আকাশ হইতে পড়িল। বিরক্ত ভাবে (ইংরাজীতে) বলিলেন, "কি অদ্ভুত প্রশ্ন! তিনি কি আমার সহিত মিশিবার উপযুক্ত লোক? ছেলে বেলায় যখন আপনার স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়িতাম, তখন বোধ হয় বাবাকে দুই একবার দেখিয়াছিলাম।"

অঘোর বাবু বাবাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাবার প্রতি এই তাচ্ছিল্যে তিনি বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দুর্ভাগ্য যে তুমি গোরক্ষপুরের লোক হইয়াও বাবাকে জান না; তুমি বোধ হয় জান না এই দেশের অনেক দূর দূরান্তর হইতে লোকে বাবাকে দর্শন করিতে আসে। তাহাদের মধ্যে আমি এমন অনেক লোক

দেখিয়াছি যাহারা সব বিষয়ে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে বাবার মত একজন মহাত্মা এখানে আছেন।” এই স্পষ্ট কথায় বোধ হয় নবীন ব্যারিষ্টার বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। অঘোর বাবুর কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

আমরা যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বাবা একা পূর্ব্বমত কুটীরের সম্মুখের দালানে বসিয়া আছেন। ব্যারিষ্টার সাহেব বাবাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন, “Halo Baba, you here” (আরে, আপনি এখানে)! অঘোর বাবু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, “বাবা ইংরাজি জানেন না।”

আমরা সকলে উপবিষ্ট হইলে সাহেব এবার হিন্দীতে বলিলেন, “আপনি এখানে কবে আসিলেন? আমি জাহাজ হইতে নামিয়া Imperial mail ধরিয়াছিলাম। কিন্তু সে গাড়ীতে আপনি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।”

অঘোর বাবু সাহেবকে বলিলেন, “তোমার কথায় মনে হইতেছে তুমি ইতিপূর্ব্বে বাবাকে যেন অন্য কোনও স্থানে দেখিয়াছ। আমার এ অনুমান কি সত্য?”

সাহেব। খুব সত্য। আমাদের জাহাজ যখন বোম্বাই হইতে একদিনের পথ, তখন আমি বাবাকে আমার কেবিনের ঠিক বাহিরে দেখিতে পাই। একজন সাধুকে প্রথম শ্রেণীর নিকট ঘুরিতে দেখিয়া আমি

কেবিন হইতে বাহির হইয়া বাবার সহিত প্রায় পাঁচ মিনিট কাল কথোপকথন করিয়াছিলাম। তাহার পর বাবা অন্য দিকে চলিয়া যান।”

আমি। আপনার কি মনে পড়ে, কবে, কোন্ সময় আপনি জাহাজে বাবার সহিত কথা কহিয়াছিলেন ?

সাহেব (বিস্মিত ভাবে)। এ প্রশ্ন কেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

আমি। আপনার এ প্রশ্নের জবাব পরে দিব। দয়া করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি ?

সাহেব। গত বুধবারে সন্ধ্যার পনের কুড়ি মিনিট পূর্ব্বে বাবার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

পাঠক জানেন, ঐ বুধবারে সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে বাবা নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় চল্লিশ মিনিটের জন্য উহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। অথচ সাহেব বলিতেছেন্ যে, ঐ সময় তিনি বাবাকে জাহাজের উপর দেখিতে পান। এ সমস্যার একমাত্র উত্তর যে বাবা সূক্ষ্ম দেহে জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

———

—):*:(—

আমি তখন গয়ায়। সেখানে উপস্থিত হইবার প্রায় পাঁচ ছয় সপ্তাহ পরে শুনিলাম, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সহরের প্রায় আট নয় মাইল দূরে এক হিন্দুস্থানী সাধুর আশ্রমে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। লোকে বলিল অপরাহ্ণ চারিটার পর মহাত্মা সকলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মার্চ্চ মাস। গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধ্যার সময় সহরে ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। পাহাড়ি দেশ। গাড়ী ঘোড়ার পথ একেবারে নাই। পদব্রজে যাইতে আসিতে হইবে। এ অবস্থায় গোস্বামীজির নিকট রাত্রিবাস করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

স্বামীজিকে আমি অন্তরের সহিত ভক্তি করিতাম। তাঁহার মত প্রকৃত সাধু সে সময় এ দেশে অতি বিরল ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বিলাতি সাধুর (গেরুয়া-ধারী এবং চা, কট্‌লেট্‌, চপ সেবীর দল) সংখ্যা আজকাল অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আজ-কালকার লোকে প্রকৃত সাধু বড় একটা দেখে না সেই জন্য প্রকৃত সাধু যে কতদূর উন্নত হইতে পারে তাহা এখন প্রায়ই লোকে ধারণা করিতে পারে না। গোস্বামীজি

যে কত উঁচু দরের মানুষ ছিলেন, তাহা হয়ত আজ-কালকার অনেকে ঠিক বুঝিবেন না।

যখন দেখিলাম অন্য উপায় নাই, একদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় স্থানীয় উকিল বিমল বাবুকে সঙ্গে করিয়া গোস্বামী দর্শনে যাত্রা করিলাম। যতদূর সাধ্য সজোরে পদচালনা করিয়াও আমরা বেলা চারিটার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারিলাম না।

আজ-কাল সাধু হওয়া একটা বেশ লাভের পেশা হইয়াছে। আমার দুইজন সহপাঠি ম্যাট্রিক ফেল হইয়া দুই চারি মাস চাকুরীর চেষ্টা করিল, যখন বুঝিল যে তাহা সংগ্রহ অসম্ভব, তখন দুইজনে 'আনন্দ' যুক্ত নূতন নাম লইয়া গৃহ ত্যাগ করিল। কিছু দিন পরে দেখি তাহারা দুইজনে দুইটি বৃহৎ আশ্রমের অধিকারী, প্রত্যেকের মাসিক আয় এত অধিক যাহা আমি দশ বৎসর চাকরী করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারি নাই।

আমরা যখন স্বামীজির আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম আশ্রমের বাহিরে একজন বৃদ্ধ সাধু বসিয়া আছেন। আশে পাশে আর কাহাকেও না দেখিয়া আমরা বিশেষ বিস্মিত হইলাম। বিজয়কৃষ্ণের মত উঁচু দরের সাধু অত্যন্ত দুর্লভ। আমি ভাবিয়াছিলাম, 'আশ্রমে যাইয়া দেখিব তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লোক দলে দলে আসিতেছে। ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্য প্রকার দেখিয়া আমি অত্যন্ত নিরাশ

হইলাম। পরে শুনিয়াছিলাম, স্বামীজি গাঁজা খান না, বড় বড় লেক্‌চার দেন না, পোযাক পরিচ্ছদেও বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। লোকে তবে কিসের টানে আসিবে ?

বৃদ্ধ সাধু বলিলেন, "স্বামীজি শীঘ্রই বাহিরে আসিবেন"। আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তিনি একা বাহির হইলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, স্বামীজি যাঁহার অতিথি, তাঁহাকেও স্বামীজির সঙ্গে দেখিব। কিন্তু তিনি আসিলেন না। পরে শুনিয়াছিলাম, তাঁহাকে লোকে 'ন্যাঙ্গা বাবা' বলিয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকেন বলিয়া লোকে নাকি তাঁহাকে এই নাম দিয়াছে।

পাঁচ সাত মিনিট কথোপকথনের পর স্বামীজি বলিলেন, "খানিকক্ষণ হইতে ন্যাঙ্গা বাবা পেটের বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন। এখন হোমিও ঔষধ পাইলে বোধ হয় কিছু সুবিধা করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাত নাই। সহর এখান হইতে অনেক দূর। কি করা যায় বলত ?" এ অবস্থায় কি করা যায় ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, সেই জন্য কোনও উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারিলাম না।

স্বামীজি আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াই বৃদ্ধ সাধুকে ন্যাঙ্গা বাবার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা কথোপকথন করিতেছি এমন সময় তিনি গোস্বামীজিকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এই সময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারিদিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায়

পাঁচ সাত মিনিট পরে স্বামীজি বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন, "কষ্টটা যেন বাড়িয়াই চলিতেছে। এই পাহাড়ে জঙ্গলে দেশ। নিকটে যে কোনও ডাক্তার কবিরাজ পাইব, তাহারও কোন আশা নাই। তাইত! কি করা যায়?" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি পাশের একটা কামরায় প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিলাম উপস্থিত তিনিই উহার মধ্যে বাস করেন।

দুই তিন মিনিট পরে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "দেখ বিশেষ একটা ক্রিয়ার জন্য আমাকে বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ মিনিট ব্যস্ত থাকিতে হইবে। এই সময়টা তোমরা দুইজনে রোগীর কাছে থাকিবে এবং যথাসাধ্য করিবে।" আমি বলিলাম, "আপনি বলেনত আমি না হয় সহরে গিয়া একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনি।"

বলিলাম বটে, কিন্তু যাইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। এই অন্ধকার রাত্রে সুদীর্ঘ জঙ্গলময় পাহাড়ের পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়া এবং ফিরিয়া আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গোস্বামীজি বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই বেশ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ইহা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব হইলেও তোমার পক্ষে এতটা পথ যাইতে এবং ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিতে প্রায় দশ এগার ঘণ্টা লাগিবে। তখন হয়ত ডাক্তার আসা না আসা সমান হইবে। তুমি রোগীর কাছে বসিয়া থাক। দেখ ইতিমধ্যে আমি কি

করিতে পারি।” তিনি বৃদ্ধ সাধুকে সঙ্গে লইয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আমি রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম রোগীর অবস্থা ভাল নয়—পেটের যন্ত্রণা প্রত্যেক মূহুর্ত্তে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই মনে হইল। রোগী কখনও চীৎকার করিতেছে, কখনও গড়াগড়ি দিতেছে। আমার বোধ হইল, অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ না হইলে রোগীকে রক্ষা করা হয়ত সম্ভব হইবে না।

এই ভাবে বোধ হয় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট অতিবাহিত হইবার পর গোস্বামীজি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে কয়েক প্রকারের ঔষধ এবং একটা খালি বোতল। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কোথা হইতে এই সব সংগ্রহ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বৃদ্ধ সাধুকে জল গরম করিতে বলিয়া রোগীকে একটা ঔষধ সেবন করাইলেন। অবিলম্বে গরম জল আসিলে তাহা সেই খালি বোতলে ভরিয়া রোগীর পেটে সেঁক দেওয়া হইল। দশ মিনিটের মধ্যে বোধ হইল যন্ত্রণার লাঘব হইয়াছে, কারণ রোগী ঘুমাইয়া পড়িল।

আমি তখন একটা শিশি লইয়া দেখিলাম, তাহার গায়ে গয়ার এক প্রসিদ্ধ কেমিষ্টের (Chemists and Druggists) লেবেল লাগান। আমি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই ঔষধ আপনি কোথায় পাইলেন?” তিনি অন্য কথা পাড়িয়া আমার প্রশ্নটা উড়াইয়া দিলেন।

রোগী ঘুমাইয়া পড়াতে আমরা সকলে নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিলাম। পর দিবস প্রাতে গোস্বামীজির নিকট শুনিলাম, গত রাত্রে প্রায় একটার সময় সহরের একজন ডাক্তার এবং তাঁহার ভৃত্য আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। রোগী ঘুমাইতেছে শুনিয়া ডাক্তার শয়ন করেন। এখনও তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। "তাঁহাকে কে সংবাদ দিল," জিজ্ঞাসা করাতে কোনও উত্তর পাইলাম না। আমি এ গোলক ধাঁধার কোনও সমাধান করিতে পারিলাম না। রাত্রে সহর হইতে ঔষধ আনয়ন এবং পরে ডাক্তারের আগমন আমার নিকট অত্যন্ত রসস্যপূর্ণ মনে হইল।

প্রাতে যখন আমরা দুইজনে (বিমল বাবু ও আমি) সহরে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, গোস্বামীজি বলিলেন, "আর দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার ফিরিবে। তোমরা তাহার সহিত যাইও।" তখন আমার মনে হইল, যে দুইটি ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমি হাবুডুবু খাইতেছি তাহার মীমাংসা হয়ত ডাক্তার করিয়া দিতে পারে। আমি গোস্বামীজির প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার আসিলেন। দুই চারিটা কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানকার রোগীর খপর আপনি কাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন?" ডাক্তার আমার এই প্রশ্নে যেন বিরক্ত হইলেন। পরে গোস্বামীজিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাঁর নিকট।

রোগী বড় কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া ইনি ঔষধ লইয়া চলিয়া আসেন।”

আমি। দেখুন, এই বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। দয়া করিয়া উত্তর দিবেন। আপনি বলিতেছেন যে, গোস্বামীজি আপনাকে রোগীর সংবাদ দেন। আচ্ছা, ঠিক কোন্ সময়ে স্বামীজি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহা আপনি বলিতে পারেন কি ?”

ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন গোস্বামীজি বাধা দিয়া বলিলেন, “আমি তোমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। তোমার হয়ত মনে আছে আমি তোমাকে ‘দেখ আমি কি করিতে পারি’ বলিয়া বৃদ্ধ সাধুকে সঙ্গে লইয়া আমার কুটীরে প্রবেশ করি। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সহরে যাইয়া আমি যখন ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা—অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমি সহরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঔষধ লইয়া যখন ফিরিয়া আসি তখন নয়টা বাজে নাই। এই সুদীর্ঘ পথ আমি কি প্রকারে এই অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছিলাম, তাহা তুমি হয়ত ঠিক বুঝিতে পারিবে না কারণ এই সব বিষয়ের চর্চ্চা তুমি কখনও কর নাই। কিন্তু ইহা সত্য এবং সাধনা করিলে তুমিও ইহা করিতে পার।”

আমি গোস্বামীজির পায়ের ধূলা লইয়া অতি সংক্ষেপে

বাবা গম্ভীরনাথের কাহিনী বিবৃত করিলাম। তাহার পর হাসিয়া বলিলাম, "আমাকে আপনি যতটা নাস্তিক মনে করেন, আমি বোধ হয় ততটা নহি। আমার শিক্ষা গুরু ভেনিস্ সাহেব আমাকে শিখাইয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অমর আত্মা রহিয়াছে। ইহাকে হস্তগত করিতে পারিলে আমরা এমন সব কাজ করিতে পারি, যাহাকে লোকে অলৌকিক মনে করে। ইহার চর্চ্চা পাশ্চাত্য দেশে হয় নাই বলিয়া তাহারা আমাদের এই সব কাজকে অসম্ভব বলে। আত্মাকে স্ববশে আনিয়া তাহার দ্বারা মনোমত কাজ করাইবার প্রণালী আজকাল পাশ্চাত্য দেশের লোকও নাকি আলোচনা করিতেছে। অধ্যাপক ভেনিস্ সাহেব আমাকে ইহাই বলিয়াছিলেন।"

গোস্বামীজি বলিলেন, "তুমি ডক্টর ভেনিসের ছাত্র। তুমি মহাত্মা গম্ভীরনাথজীর পদপ্রান্তে বসিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছ! তুমি কখনও নাস্তিক হইতে পার না। আমার মনে হয়, তোমার দ্বারা আমাদের লুপ্তপ্রায় বিদ্যার বহুল প্রচার হইবে। বাবা গম্ভীরনাথের ন্যায় মহামানব এখনও এ দেশে আছে। যদি তোমার আন্তরিক চেষ্টা থাকে তুমি তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ওপারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ

অনেকে মনে করে যে কাহারও মৃত্যু হইলে আমাদের সহিত তাহার আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। ইহাঁরা বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাক বা না থাক কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে তাহার আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না।

উপরোক্ত মতের বিন্দুমাত্র মূল্য নাই। আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিরা বেশ পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন যে, ওপারের আত্মার সহিত এপারের সম্বন্ধ অতি নিকট। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সে কালের মুনি ঋষিগণকে humbug (প্রতারক) বলিয়া মনে করেন। তাহাদের ধারণা মুনিঋষিদের সব কথাই বিজ্ঞান বিরুদ্ধ (unscientific) এবং বিচার বিরুদ্ধ (Irrational)।

কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ যে অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা আত্মার বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, আজকাল য়ূরোপ ও আমেরিকার অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক তাহাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই সব বিষয় তাঁহারা যেভাবে আলোচনা করিতেছেন তাহাতে প্রথম নম্বরের বিশ্বনিন্দুকও বলিতে বাধ্য যে, উহারা বিজ্ঞান

সম্মত। প্রেতাত্মা সম্বন্ধে ঐ সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কি ভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং তাহার ফল কি হইয়াছে, ইহা আমরা সবিস্তারে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। (আমার **ইহলোক ও পরলোক** দ্রষ্টব্য।) এই স্থানে শুধু এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, মৃত্যুর পর অধিকাংশ আত্মাই ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চায়। কিন্তু ইহলোকের মত পরলোকও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত। এই সকল নিয়ম কানুন না জানার জন্য অনেক আত্মা ইচ্ছা থাকিলেও এপারে আসিতে পারে না। কিন্তু যাহারা ওপারে গিয়া ভাল পথ-প্রদর্শক (guide) পায় তাহারা অল্পায়াসেই এপারে উপস্থিত হয়। যে প্রণালী দ্বারা আমরা ওপারের আত্মাকে এপারে আনিতে পারি তাহা আমরা কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি। এমন দিন হয়ত শীঘ্রই আসিবে যখন আমরা ওপারের আত্মাকে যখন ইচ্ছা এপারে আহ্বান করিতে পারিব।

(১)

—):*:(—

এলাহাবাদের কট্‌রা মহল্লার চৌধুরী বংশ চারি পুরুষ ধরিয়া এখানকার অধিবাসী। মহল্লার এক প্রান্তে এক বৃহৎ বাগানের মধ্যে তাঁহাদের বিশাল বাংলা দেখিলে বেশ স্পষ্ট জানা যায় যে, লক্ষ্মী দেবী এই বংশের উপর বিলক্ষণ সদয়। দেবীর সপত্নী সরস্বতীর অনুগ্রহও এখানে যথেষ্ট। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ইহাঁদের বংশে চারিজন এড্‌ভোকেট, দুইজন ব্যারিষ্টার ও দুই জন বেশ বড় সরকারী চাকুরে।

ঐ বাড়ীর রাজেন্দ্র চৌধুরী আমার বাল্য বন্ধু। যে সময়ের ঘটনা বিবৃত করিব তখন তাঁহার বয়স প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ বৎসর। প্রায় আট বৎসর যাবত সে ওকালতি করিতেছে। আমি তখন চাকরী উপলক্ষে এলাহাবাদে। আমি প্রায়ই তাহার কাছে যাইতাম বা সে আমার নিকট আসিত। সেই জন্য আমি তাহার বাড়ীর সকলকে বেশ ভাল করিয়া জানিতাম।

রাজেনের স্ত্রী বিরাজের বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে। ইহাঁদের বিবাহের এগার বৎসর পরের ঘটনা আমি বিবৃত করিতেছি। সচরাচর দেখা যায় বিবাহের পর দম্পতীর মধ্যে প্রথম প্রথম কিছুদিন পর্য্যন্ত ভালবাসাটা খুব

তীব্র থাকে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে এই তীব্রতার হ্রাস পায়। রাজেনের বিবাহিত জীবন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

বিবাহের পূর্ব্বে রাজেন ঘোর আড্ডাবাজ ছিল। সহস্র প্রকারের কাজ থাকিলেও সে অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত কখনও বাড়ী থাকিত না। ক্লাবে প্রত্যহ হাজ্‌রির জন্য যদি কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হইত, তাহা হইলে সে যে প্রত্যেক বৎসর প্রথম পুরস্কার পাইত ইহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ ছিল না। এজন্য তাহাকে অনেক সময় বাড়ীর কর্ত্তাদের নিকট শক্ত কথা শুনিতে হইত, কিন্তু সে নিজের স্বভাব ছাড়ে নাই।

বিবাহের পর কিন্তু তাহার এই স্বভাব একেবারে বদলাইয়া গেল। সে ক্লাবে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিল। এমন কি ক্লাবের বিশেষ কাজ থাকিলেও সে বাড়ী ছাড়িত না। ইহার জন্য অবশ্য তাহাকে বন্ধুদের নিকট বেশ কড়া কড়া উপহাস সহ্য করিতে হইত। বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত তাহাকে এমন সব কথা শুনাইত যে, তাহার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিত—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। স্ত্রীর অঞ্চলের ছায়া সে কোনও মতে ছাড়িত না।

প্রথম প্রথম সকলে মনে করিয়াছিল যে, তাহার এই মোহ ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না আমি যে ঘটনার বর্ণনা করিব তাহা বিবাহের এগার বৎসর

পরের কথা। কিন্তু তখনও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা তাহার তিলমাত্র কম হয় নাই। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, যতদূর আমরা বুঝিতে পারিতাম তাহাতে মনে হইত যে, স্বামী যে পরিমাণ বিরাজকে ভালবাসিত, স্ত্রীর ভালবাসা বোধ হয় তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম ছিল না।

এইবার সেই দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করি। সময়টা বোধ হয় ফাল্গুন মাস। বিরাজ একদিন হঠাৎ পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। ইহার ষষ্ঠ দিনে স্বর্গের ফুল স্বর্গে চলিয়া গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় রাজেনের কি অবস্থা হইল তাহা অনুমান করা বিশেষ কঠিন নয়। তাহার পুত্র কন্যা ছিল না। ব্যবস্থা হইল যে স্ত্রীর মুখাগ্নি তাহাকেই করিতে হইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ ব্যাবস্থায় কোনও ফল হইল না। রাজেন কোন মতে শয়ন কক্ষ ত্যাগ করিয়া শ্মশানে গেল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর কেহ তাহার চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখিল না। সকলেই এই ঘটনায় বিলক্ষণ চিন্তিত হইয়া পড়িল।

মৃত্যুর পর দিবস প্রাতে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কেন তোমরা 'মৃত্যু মৃত্যু' করিতেছ? তোমরা যেন মনে করিতেছ যে, সে আমায় চিরদিনের মত ছাড়িয়া গেল। ভুল, ভুল, তোমাদের মস্ত ভুল। তোমরা দেখিও, সে অতি শীঘ্র আবার আমার কাছে আসিবে। যদি নিতান্ত দেখি সে আসিল না,

তখন বুঝিব তাহাকে কেহ ওপারে আটক করিয়াছে। তখন অবশ্য আমাকে উহার কাছে যাইতে হইবে।"

এই ভয়টাই আমরা সকলে করিতেছিলাম। তাহার সে সময় মনের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করা অতি সহজ বলিয়া মনে হইতেছিল। উপস্থিত একজন প্রাচীন ব্যক্তি বলিলেন, "তুমি একটা কথা কখনও ভুলিও না। স্বাভাবিক মৃত্যুর পর লোকে যেখানে যায়, আত্মহত্যা করিলে সেখানে কোনও মতে যাইতে পারিবে না। আত্মহত্যাকারীর জন্য ওপারে বিশেষ স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি যদি আত্মহত্যা কর, তাহা হইলে ওপারে যাইয়া স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইবে না। ইহাতে ক্ষণিক শান্তি হয়ত পাইতে পার, কিন্তু শেষে তোমাকে অনন্ত কাল অনুতাপ করিতে হইবে।" উপদেশটা বোধ হয় নিতান্ত ব্যর্থ হইল না। কারণ ইহার পর রাজেন এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলিল না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর রাজেন এক মিনিটের জন্যও শয়ন কক্ষ ত্যাগ করিত না। অনেকে তাহাকে সাধ্যমত বুঝাইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। শেষে একদিন আমি এই কথাটা উত্থাপন করিলাম। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, আমি কি জন্য এ ঘর ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতে পারি না? আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, বিরাজ একদিন নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। আমার

অনুপস্থিতিতে সে যদি আসে এবং আমায় যদি না দেখিতে পায় তবে হয়ত আর কখনও আসিবে না।” তাহার ঐ অদ্ভুত খেয়াল দেখিয়া বুঝিলাম যে, এ বিষয়ে তাহাকে বোঝান অসম্ভব। আমার ভয় হইল যে, সে স্ত্রীর শোকে পাগল না হইয়া যায়।

মৃত্যুর দশ দিন পরে সে নিজের শয়ন কক্ষে কাহাকেও যাইতে দিবে না বলিয়া প্রচার করিল। কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে সে দ্বারে দাঁড়াইয়া উহা গ্রহণ করিত। তাহার আত্মীয় এবং বন্ধুরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। এই ভাবে একমাস গত হইল।

একদিন রাত্রি প্রায় বারটার পর বাড়ীর লোকেরা শুনিল যেন দুইজন লোক রাজেনের কক্ষ মধ্যে কথোপকথন করিতেছে। রাজেন যে কাহারও সহিত কথা কহিতেছে তাহা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু অপর লোকটি কে? তাহার কক্ষের দুই দিকে দুইটি কামরায় তাহার এক ভাই ও বৃদ্ধা জননী শয়ন করিতেন। এই কথোপকথনের শব্দ প্রথমে তাহার ভ্রাতার কর্ণগোচর হয়। সে নিজের নিদ্রিতা স্ত্রীকে এই সংবাদ দেওয়াতে, স্ত্রী অবিলম্বে রাজেনের কক্ষ দ্বারে কান পাতিয়া দাঁড়াইল। সে স্পষ্ট বুঝিল ঘরের মধ্যে দুইজন লোক কথোপকথন করিতেছে। সে ভীতভাবে স্বামীকে আসিয়া ঐ সংবাদ দিল। স্বামী

(রাজেনের ভাই) প্রথমে মাকে উঠাইল, তাহার পর তিনজনে রাজেনের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতরে যে দুইজন কথা কহিতেছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। উহার মধ্যে একজন রাজেন। অপর যে কে তাহা ঠিক ধরা গেল না। সে অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। তবে সে যে স্ত্রীলোক, ইহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ রহিল না।

মা সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। পুত্র ও বধূ কোনও মতে তাঁহাকে ধরিয়া তাহার শয়ন কক্ষে লইয়া আসিলেন। তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "তাইত কা'কে বাড়ীর মধ্যে আনিল? এ বংশেত এমন কাজ কেউ কখনও করেনি! ভগবান বউমাকে না নিয়ে যদি আমাকে নিতেন তাহ'লেত এমন কলঙ্ক হ'ত না।" তাহারা দুইজনে অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিল।

আমি রাজেনের বাল্য বন্ধু বলিয়া পর দিবস প্রাতেই আমার ডাক পড়িল। আমি রাত্রের ঘটনার কথা সমস্ত শুনিয়া রাজেনের ভাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ধারণা, রাজেন কোনও স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিতেছিল। আচ্ছা, ইহা কি হইতে পারে না যে সে নিজের স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছিল?" ভায়া ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিল, "কি যে বল তাহার ঠিকানা নাই। স্ত্রী কোথা হইতে আসিবে?"

আমি। এমনওত হইতে পারে যে সে কল্পনা করিয়া লইয়াছিল যে তাহার স্ত্রী আসিয়াছে।

ভায়া। তোমার আন্দাজকে বাহাদুরি দিতেছি, কিন্তু তা' অসম্ভব। কাম্‌রায় যে দুইজন লোক ছিল তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু একটা কথা এখন মনে পড়িতেছে। রাজেন যে সব কথা বলিয়াছিল তাহা স্বামী স্ত্রীকে বলিতে পারে বটে। কিন্তু এত অসম্ভব কথা!

আমি। রাজেন এখন কি করিতেছে?

ভায়া। ভাল কথা মনে করাইয়াছ। আজ সকালে ভায়া আবার অন্দর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। সে এখন বাহিরে তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া আছে। শুনিলাম, আজ নাকি কাছারি যা'বে।

কেন ঠিক বলিতে পারি না, রাজেনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আমার সর্ব্বাঙ্গ এক অভূতপুর্ব্ব আতঙ্কে ভরিয়া গেল। ব্যাপারটা কি? রাত্রের ঘটনার সহিত এই পরিবর্ত্তনের কি কিছু সম্বন্ধ আছে? আমি তৎক্ষণাৎ রাজেনের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে তাহার চেহারা ও ভাবভঙ্গিতে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে সে রোজ শেভ্ (shave) করিত, কিন্তু মৃত্যুর পর সে ক্ষুর স্পর্শ করে নাই। আজ দেখি পুনরায় shave আরম্ভ করিয়াছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল, আজ মনের মধ্যে কোনও প্রকার গ্লানির যেন চিহ্ন নাই। আমাকে দেখিয়া সহাস্যে বলিল, "ব্যাপার কি বলত? এ

সময়ত তুমি প্রায় আস না। আজ কি তোমার ওখানে Tea party ?"

তখন আমি তাহাকে রাত্রের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যই কি রাত্রে তোমার ঘরে কেহ আসিয়াছিল ?', প্রায় দুই তিন মিনিট নিস্তব্ধ থাকিবার পর সে বলিল, "গল্প শুনিয়াছি সে কালের কেহ কেহ তপস্যা করিয়া নিজের আরাধ্য দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছে এবং ইচ্ছামত বর পাইয়াছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় একমাস কাল দিন রাত্রি আমি বিরাজকে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছি। অবশ্য গরুড়াসনে বা পদ্মাসনে বসিয়া, নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র জপ করা হয় নাই। কিন্তু আমি যেমন একাগ্র চিত্তে তাহার আরাধনা করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় সেকালের সাধকেরাও পারিত না। তাহার ফলও পাইয়াছি। সে কাল আমার কাছে আসিয়াছিল এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল ছিল। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে সে এখন প্রত্যহ আসিবে।"

তাহার এই কাহিনী শুনিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম। আমাকে নীরব দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, "কি হে, কথাটা বুঝি বিশ্বাস করিলে না ? কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তুমি যদি ইচ্ছা কর আজ রাত্রি বারটার পর আমার ঘরের দরজায় আড়ি পাতিও। সে তাহার এখানে আসিবার কি কাহিনী বলিল শুনিবে ? তাহার মৃত্যুর পর আমি যে দিন রাত্রি তাহার ধ্যান করিতাম, তাহা সে জানিত এবং

সেই জন্য সে ওপারে ভীষণ অশান্তি ভোগ করিত। ওপারের একজন সাধু নাকি বিরাজের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে 'এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা বলিবার উপায় বলিয়া দেন। একটা কথা কিন্তু আমি তোমার কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। মৃত্যুর পর কেহ ফিরিয়া আসে এ কথা আমাকে যদি কেহ এক দিন আগে বলিত আমি কখনও বিশ্বাস করিতাম না। বিরাজ আমার একটা মস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

ঐ দিন রাত্রে আমি ও রাজেনের দুই ভাই বারটার পর যথাসাধ্য নীরব নিস্তব্ধভাবে বিরাজের শয়ন কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দিনের বেলায় কপাটে দুইটা ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেখিলাম রাজেন শয্যার উপর বসিয়া আছে। কক্ষের মধ্যে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

শুনিলাম রাজেন বলিতেছে, "আজও সেই বারটার পর। আমি কিন্তু সন্ধ্যা থেকে এই স্থানে ব'সে আছি। কাল থেকে ঠিক সন্ধ্যার পরই আসবে।"

একটি অদৃশ্য স্ত্রী-কণ্ঠ বলিল, "তোমাকেত কালই বলিয়াছি, রাত্রি বারটার আগে আসা অসম্ভব। তুমি কি মনে কর আমি আসতে পারি, আসি না?" শব্দটা বেশ স্পষ্ট কানে আসিল, কিন্তু বক্তাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইলাম না।

আমরা প্রায় পনের মিনিট ছিলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু রাজেনের কথার ভাব ভঙ্গিতে বেশ বুঝিলাম যে, সে বিরাজকে বেশ স্পষ্ট দেখিতেছে। একবার সে বলিল, "আজও তুমি ঐ শোফাটায় বসিয়া আছ। এক সেকেণ্ডের জন্যও কি এই বিছানায় বসিতে পার না ?"

* * * * *

ইহার পর রাজেনের বিশেষ অনুরোধে তাহার ঘরে আড়ি পাতা বন্ধ করিরা দেওয়া হইল। তবে তাহার ভ্রাতৃ-বধূরা এই নিষেধ শুনিয়াছিল কিনা ঠিক বলিতে পারি না। এই ভাবে বাইশ দিন গত হইল।

ত্রয়োবিংশ দিবসের অপরাহ্নে রাজেন আমায় ডাকিয়া পাঠাইল। যাইয়া দেখি তাহার আরও চারি পাঁচ জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত সে নিজের শয়ন কক্ষে বসিয়া আছে। এই বাইশ দিন সে প্রত্যহ নিজের বৈঠকখানায় বসিতেছিল। আজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজেন বলিল, "সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে এই ঘরটি আমার প্রিয়তম স্থান। আজ আমি সমস্ত দিন এই ঘর ছাড়ি নাই। আজ কাছারিও যাই নাই। কে জানে কাল এই ঘরে বসিতে পাইব কি না।"

তাহার এই কথায় আমি, কেন বলিতে পারি না, চমকিয়া উঠিলাম। এ কথার অর্থ কি? কাল এ ঘরে কেন বসিতে পাইবে না। তাহাকে নানা ভাবে প্রশ্ন করিয়াও

ইহার কোনও সদুত্তর পাইলাম না। বিদায় লইয়া চলিয়া আসার সময় রাজেন আমাদের সকলকে অনুরোধ করিল যেন ঐ দিন ঠিক সন্ধ্যার পর আমরা তাহার সহিত ভোজন করি। এই প্রকার নিমন্ত্রণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে রাজেন হাসিয়া বলিল, "কে জানে হয়ত তোমাদের সহিত একত্রে বসিয়া খাইবার অবসর আর পা'ব না।"

রাত্রে আহারাদির পর প্রায় নয়টার সময় তাহার নিকট বিদায় লইবার সময় সে বলিল, "আজ আমার ফুল-শয্যা হইবার কথা আছে। ইহা হইল কি না কাল প্রাতে জানিতে পারিবে।" কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বুঝাইয়া দিতে বলায় সে বলিল, "বিরাজ চলিয়া যাওয়াতে যে ভীষণ যন্ত্রণা এত দিন ভোগ কর্‌ছিলুম তাহা বোধ হয় আজ শেষ হ'বে।" কি ভাবে যে শেষ হ'বে তাহা সে কোন মতে বলিল না।

পরদিবস সংবাদ পাইলাম যে, গত রাত্রে রাজেনের হার্ট ফেল (heart fail) হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। ঠিক কটার সময় ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা কেহ জানে না।

—):*:(—

মহেন্দ্রনাথ রায় এক জন পেন্‌সন্-ভোগী সিভিল সার্জ্জন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র-বধূ ও একমাত্র নাতি অমিয়কুমার।

নাতিকে লইয়া মহেন্দ্র বাবু প্রত্যহ অপরাহ্নে কারে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। এক দিন তাঁহারা এই ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে সহর হইতে একমাইল দূরে এক বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেন। ঘুরিতে ঘুরিতে বাগানের এক প্রান্তে এক জীর্ণ ক্ষুদ্র বাসভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এই বাগানের মালী তাহার স্ত্রী ও তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রের সহিত এই বাড়ীতে বাস করিত। পাঁচ ছয় দিনের ব্যবধানে তাহারা স্বামী ও স্ত্রী কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা নূতন মালী হইয়া আসে ও ঐ বাড়ীতে বাস করিতে থাকে। মৃত মালীর শিশু-পুত্রের ভার ঐ নূতন মালীর স্ত্রীর উপর অর্পিত হয়।

শিশুর মাতার মৃত্যুর (স্ত্রী শেষে মরে) তিন দিন পরে এক দিন রাত্রি প্রায় দুইটার সময় শিশুর নিদ্রা ভঙ্গ

হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মা কোলে কর' 'মা কোলে কর' বলিয়া অতি উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে থাকে। তাহাকে শান্ত করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ ভাবে চীৎকার করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার পরই প্রচার হইল যে, ঐ বাড়ীতে ভূত আছে। নূতন মালী এ বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতে লাগিল। সেই হইতে বাড়ীটা খালি পড়িয়া ছিল।

মহেন্দ্র বাবু নাতিকে লইয়া ঐ বাড়ীর নিকট যখন উপস্থিত হইলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নাতি ঐ বাড়ীর একটা ভাঙ্গা চাতালের উপর হঠাৎ বসিয়া পড়িল এবং বলিল, "আমি বড় থ'কে গেছি (ক্লান্ত হইয়াছি)। দাদু বোছো।" দাদু বসিবেন কিনা ভাবিতেছেন এমন সময় বালক অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "দাদু, দাদু, একটা খোকা দ্যাখ। আহা ওযে বড্ড কাঁদছে," ইহার পর বালক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। সঙ্গে গাড়ী ছিল। তাঁহারা বাড়ী আসিয়া অবিলম্বে ডাক্তার ডাকাইলেন। প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে তাহার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু 'দাদু, খোকা বড্ড কাঁদছে,' 'আহা বড্ড কাঁদছে' ছাড়া আর কোনও কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। ছয় সাত মিনিট পরে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। এইভাবে দুই দিন অতিবাহিত হইল। সহরে ভাল চিকিৎসক বলিয়া যাহার একটু সুনাম ছিল সকলেই আসিলেন এবং সাধ্যমত পরামর্শ দিলেন ও চিকিৎসা করিলেন,

কিন্তু সেই যে পাঁচ সাত মিনিট অন্তর অজ্ঞান হওয়া এবং জ্ঞান হইলে 'খোকা বড্ড কাঁদছে' বলিয়া চীৎকার করা বন্ধ হইল না।

মহেন্দ্র বাবুর সহিত আমার সামান্য জানা শুনা ছিল। আমি যে পরলোক-তত্ত্ব লইয়া নাড়া চাড়া করি, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বোধ হইত তাঁহারও এ বিষয়ে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা আছে। নাতির পীড়ার তৃতীয় দিবসে তিনি আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং আমি উপস্থিত হইলে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া ঐ রোগের বিষয়ে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "এই সহরে এক গুজরাটি সাধু আছেন। আপনার আপত্তি না থাকিলে তাঁহাকে আমি কেস্‌টা (case) দেখাইতে চাই।" তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

সাধু আমার বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন। তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলাতে তিনি রোগীকে দেখিতে চাহিলেন। প্রায় দশ মিনিট কাল বালকের শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া তিনি উহার কার্য্যাবলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন এবং পরে রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "আপনি প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কি?"

মহেন্দ্র বাবু। আমি এ সম্বন্ধে সামান্য যাহা কিছু জানিয়াছি তাহাতে আমার ধারণা প্রেত আছে। কিন্তু তাহারা আমাদের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ

রাখিতে পারে কিনা তাহা আমি জানি না। রোগীর বিষয়ে আপনার কি ধারণা?

সাধু। আমার বিশ্বাস ইহা কোনও শান্তিহীন প্রেতের কাজ। উহাকে শান্ত করিতে না পারিলে রোগী নিরাময় হইবে না। আজ সন্ধ্যার পর আমি এই স্থানে আসিব। যেখানে রোগের প্রথম আক্রমণ হয় আমায় তথায় লইয়া যাইতে হইবে।

স্থির হইল যে সন্ধ্যার পর সাধুকে লইয়া আমি ও মহেন্দ্র বাবু পূর্ব্বোক্ত বাগানে গমন করিব। রোগী আমাদের সঙ্গে যাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সাধু বলিলেন যে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

আমরা তিন জনে রাত্রি প্রায় আটটার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে মহেন্দ্র বাবুর নাতি বসিয়াছিল, সাধু সেই স্থানে বসিলেন। আমরা দুইজনে প্রায় পনের ষোল ফুট দূরে উপবিষ্ট হইলাম। একটা সাধারণ হরিকেন্ ল্যাম্প আমাদের নিকট জ্বলিতে লাগিল।

সাধু চারি পাঁচ মিনিট নীরব নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন—বোধ হইল যেন ধ্যান করিতেছেন। তাহার পর অনুচ্চস্বরে একটা হিন্দী ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। উহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ শুনিলাম যেন কোনও শিশু নিতান্ত আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল (হিন্দী ভাষায়) 'মা কোলে

কর,' 'মা কোলে কর'। এই শব্দটা যেন সেইখানে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল—কখনও মনে হয় খুব নিকটে, কখনও বা যেন দূরে চলিয়া গেল।

সাধু ঐ সময় ভজন ছাড়িয়া একটি সংস্কৃত স্তব উচ্চকণ্ঠে সুরের সহিত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। উহা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু 'মা কোলে কর' ধ্বনি সমভাবে চলিতে লাগিল। সাধু তখন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, (হিন্দী ভাষায়), "অরে শিশু, কেন তুই বৃথা কাঁদিতেছিস্। তোর মা তোর কাছেই আছে। ভাল করিয়া তলাস্ কর্ মাকে পাইবি।" ইহার পরও যখন 'মা, কোলে কর্' শব্দ চলিতে লাগিল, তখন সাধু প্রায় পনের ষোল মিনিট কাল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন। উহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—"হে ভগবন্! তুমি শিশুর পিতা মাতাকে অগ্রেই লইয়াছ। এই শিশু ওপারে যাহাতে পথ চিনিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দাও—উহার মার চক্ষু তুমি বন্ধ করিয়া দিয়াছ তাহা খুলিয়া দাও, যেন এই শিশু নিজের মাকে চিনিতে পারে!"

এই প্রার্থনা এমন মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে আমরাও চক্ষু-জল সম্বরণ করিতে পারি নাই। উহা যে ভগবানের হৃদয় স্পর্শ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিসে কি হইল বলিতে পারি না (কারণ এ সব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ)। কিন্তু সাধুর প্রার্থনা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দটা বন্ধ হইয়া গেল। ইহার

পর সাধু আরও প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল স্তবপাঠ ও প্রার্থনা করিলেন, তাহার পর মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস আপনার পৌত্র আরোগ্য হইয়াছে।"

আমরা সকলে মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, আমাদের ফিরিবার প্রায় পনের মিনিট পূর্ব্বে অমিয় নিদ্রিত হইয়াছে। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইল যেন সে রোগ-মুক্ত হইয়াছে। রোগাক্রমণের পর সে ক্রমাগত পনের মিনিট কাল নিদ্রা যায় নাই।

সে নিদ্রা তাহার পর দিবস প্রাতে ভঙ্গ হইল। তখন দেখা গেল তাহার শরীরে রোগের চিহ্ন মাত্র নাই।

—):*:(—

বাবু চন্দ্রিকা প্রসাদ এক সরকারী স্কুলের শিক্ষক। লোকটি বিশেষ ধর্ম্ম ভীরু এবং পরোপকারী। প্রায় বার-বৎসর কাল আমি তাহাকে দেখিতেছি, কিন্তু কখনও তাহার মুখে একটি মিথ্যা কথা শুনি নাই।

তিনি তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ লক্ষ্ণৌ মেডিকেল্ কলেজের পাস করা এক ডাক্তারের সহিত দেন। তখন মেয়ের বয়স পনের বৎসর। তিন বৎসর পরে প্রথম প্রসবের পর মেয়েটি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়। স্বামী ডাক্তার বলিয়া সহরের সমস্ত বড় বড় ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিল, কিন্তু বিন্দুমাত্র ফল হইল না। বরং উহা উৎকট রক্তামাশয়ে পরিণত হইল। রোগীর দিন রাত্রে প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বার রক্ত দাস্ত হইতে লাগিল। এলোপ্যাথরা বলিলেন, রোগ আরোগ্য হইবে না। তাঁহারা চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই পীড়ায় হোমিওপ্যাথির অদ্ভুত নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া চন্দ্রিকা প্রসাদ কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। তখন সুপ্রসিদ্ধ ইউন্মান সাহেব বর্ত্তমান। তিনি রোগী দেখিয়া বলিলেন, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে চিকিৎসায় ফল না হয়, তিনি

রোগীকে আর ঔষধ দিবেন না। তিনি ইহাও বলিলেন যে, রোগ ঔষধের ক্ষমতার প্রায় বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

সাত দিন চিকিৎসায় যখন কোনও ফল হইল না, তখন সকলে মনে করিল যে, আর কোনও আশা নাই। কিন্তু যতদিন প্রাণ আছে, চিকিৎসাও বন্ধ করা যায় না। তখন স্থির হইল যে, এখন রোগীকে কোনও ভাল কবিরাজের হাতে দেওয়া হউক।

চন্দ্রিকা প্রসাদের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। সে আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। ঘটনাক্রমে আমি তখন কলিকাতায়। আমার পরামর্শে একদিন আমরা গ্রে-ষ্ট্রীটের এক অতি প্রবীণ কবিরাজকে আহ্বান করিলাম। সে সময়ে তাঁহার মত নাড়ী-জ্ঞান আমি কলিকাতায় অতি কম লোকেরই দেখিয়াছি।

ইনি রোগীকে বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তাহার পর আমাকে (চন্দ্রিকা প্রসাদ বাঙ্গলা জানিতেন না, কবিরাজ মহাশয় হিন্দী জানিতেন না) বলিলেন, "রোগিণীর ভিতর এমন তিলমাত্র শক্তি নাই যে এই বিষম ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদের ঔষধকে সাহায্য করিতে পারে। ভিতরে শক্তি না থাকিলে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধেও কোন কাজ হয় না। আমার মতে যদি কাজ কর, তাহা হইলে আর কোনও ঔষধ সেবন করাইও না। এ সময় একটা উপায় আছে। যদি ভগবান উঁহাকে

বাঁচাইতে চান, তবে উহাই একমাত্র উপায়। উপায়টা এই— 'তুমি বাবা তারকনাথের নাম অবশ্য শুনিয়াছ। রোগিণীর পিতাকে বল, তিনি বা তাঁহার স্ত্রী তারকনাথে যাইয়া হত্যা দিন। বাবা দয়া করিলে এই দুরারোগ্য রোগও আরোগ্য হইয়া যাইতে পারে।"

চন্দ্রিকাপ্রসাদ আজকালকার হিসাবে বিশেষ উচ্চশিক্ষিত। সুতরাং তাহাকে যখন আমি কবিরাজ মহাশয়ের কথা বুঝাইয়া বলিলাম, সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনি কি ইহা সম্ভব মনে করেন?" আমি বলিলাম, "অসম্ভব বলিয়াত মনে হয় না। তুমি যদি একান্ত মনে ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হত্যা দাও, তবে ফললাভ আমি আদৌ অসম্ভব মনে করি না।"

চন্দ্রিকাপ্রসাদ। তাহাই যদি হয় তবে এই কামরার মধ্যে হত্যা দিলেও ত ফললাভ হইতে পারে। তারকনাথের মন্দিরে যাইবার কি প্রয়োজন?

এক সময় আমারও এই প্রকার ভাব ছিল। ইংরাজি শিক্ষিত সকলেরই বোধ হয় এই প্রকার হয়। সেই জন্য তাহার কথায় আমি বলিলাম, "তারকনাথের মন্দিরে যদি তুমি কখনও যাও দেখিবে যে সেখানে প্রতিদিন শত শত লোক সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া ভগবানের আরাধনা করিতেছে। শত শত বৎসর ধরিয়া এইরূপ হইতেছে। যে স্থানে যুগ যুগ ধরিয়া শত শত লোক ভগবানকে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা

উপহার দেয়, সে স্থান ও একটা সাধারণ স্থানের মধ্যে যে একটা পার্থক্য থাকে তাহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি অতি বড় পাষণ্ডও ঐ স্থানে গিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য নিজের কলুষিত মনের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছে। এই জন্যই হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান্‌ প্রভৃতির মধ্যে তীর্থ দর্শনের এত প্রশংসা।"

চন্দ্রিকাপ্রসাদ তখন জিজ্ঞাসা করিল যে হত্যা দিতে হইলে কি ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "এই হত্যা দেওয়াকে লোকে যত সহজ মনে করে, আসলে ইহা তাহা নয়। সংসারের সমস্ত চিন্তাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। শুধু ভাবিবে যে তোমার কন্যা অত্যন্ত পীড়িতা এবং বাবার দয়া ভিন্ন উহা কোনও মতে ভাল হইতে পারে না। এই ভাবটা যদি মনে না আনিতে পার তবে হত্যা দিয়া কোনও ফল নাই।"

চন্দ্রিকাপ্রসাদ বলিল, "কথাটা ভাবিয়া দেখি।" পর দিবস সে বলিল, "দেখুন হত্যা দেওয়া বড় কঠিন কাজ মনে হইতেছে। আমি প্রথমে বাড়ীতে কয়েক দিন এ বিষয়ে সাধনা করিতে চাই। তাহার পর যদি বুঝি আমার দ্বারা হইবে, আমি হত্যা দিব।"

উহার চারিদিন পরে চন্দ্রিকাপ্রসাদ বলিল, "আমি এ কয়দিন ৫।৬ ঘণ্টা প্রত্যহ মনস্থির করিবার সাধনা করিয়াছি।

এখন বোধ হইতেছে আমি পারিব। কিন্তু আপনাকে আমার সহিত তারকেশ্বরে যাইতে হইবে।”

পরদিবস তারকেশ্বরে উপস্থিত হইলাম এবং এ বিষয়ে গোড়ায় যাহা যাহা করিতে হয় চন্দ্রিকাপ্রসাদ তাহা করিয়া ঐ দিনই সন্ধ্যার পর হত্যা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

আমি পরদিন অতি প্রত্যুষে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখি চন্দ্রিকাপ্রসাদ স্নান করিয়া পূজা করিতেছে। উহা শেষ হইবার পর সে বলিল, “আমার কাজ সফল হইয়াছে কিনা তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। রাত্রি প্রায় তিনটার পর নিদ্রিতা-বস্থায় যেন দেখিলাম আমার স্বর্গীয় পিতা আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর যে প্রকার চেহারা ছিল, যে পোষাক পরিয়াছিলেন, আমার কাছেও ঠিক সেইভাবে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি গৌরির (মেয়ের নাম) পীড়ার জন্য বড় কষ্ট পাইতেছ। তুমি কালই কলিকাতায় ফিরিয়া যাও। সেখানে যে কবিরাজ তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলেন তাঁহাকে যাইয়া বল যে তিনি যেন গৌরিকে এ অবস্থায় রক্তামাশয়ের যে ঔষধ উপযুক্ত মনে করেন সেবন করিতে দেন। তারকনাথের দয়ায় ইহাতেই ফল হইবে। তাহার পরই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আপনার কি ধারনা? আসিলাম বাবার কাছে। কিন্তু আসিলেন পিতাঠাকুর!”

আমি বলিলাম, “তোমার পিতার আগমন যে বাবার দয়ায় হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?” মুখে ঐ কথা

বলিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা আমি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। একি সত্যই হত্যা দিবার ফল? চন্দ্রিকা-প্রসাদ কি বিকৃত মস্তিষ্কে স্বপ্ন দেখিয়াছে?

আমরা সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া পরদিন হইতে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। যে রোগকে যুক্ত প্রদেশের সমস্ত বড়.বড় ডাক্তার এবং কলিকাতায় ইউনান্ সাহেব অসাধ্য বলিয়াছিলেন তাহাই ঐ ঔষধে বাইশ-তেইশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হইল। ঘটনাটি আগা-গোড়া আমার সম্মুখে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। চন্দ্রিকাপ্রসাদ ও তাহার সেই কন্যা এখনও জীবিত।

—):*:(—

নিম্নের কাহিনীটি আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। তবে ইহার একজন নায়ক নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ইহা আমাকে বলিয়াছিল। ইহার পর আমি ঘটনাস্থলে যাইয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়াছিলাম এবং তাহাতে দেখিলাম যে সামান্য অতিরঞ্জন ছাড়িয়া দিলে প্রকৃত ঘটনার সহিত ভট্টাচার্য্যের কাহিনীর বিশেষ প্রভেদ নাই।

হুগলি জেলায় ইলিপুর গ্রামের নিকট বন্দিপুর। প্রায় চল্লিশ বৎসর পুর্ব্বে ঐ গ্রামের অহিভূষণ মল্লিক পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বসিল। বড় লোকের একমাত্র সন্তান বলিয়া বাল্যকাল হইতেই উহার স্বভাব অত্যন্ত ভীষণ ও দুর্দ্দান্ত হইতেছিল। পিতার মৃত্যুর সময় মল্লিকের বয়স তেইশ বৎসর। বড় লোকের 'বখাট' ছেলে হাতে সম্পত্তি পাইলে যে ভাবে উচ্ছন্নের পথে অগ্রসর হয় মল্লিক তাহাতে কোনও ভুল করিল না।

এক বৎসরের মধ্যে তাহার অত্যাচার এ প্রকার বাড়িয়া উঠিল যে গ্রামের মধ্যে যাহাদের সুন্দরী বৌ ঝি ছিল তাহাদের অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মল্লিকের বৈঠকখানায় কলিকাতা হইতে আনীত 'সুন্দরীদের' নৃত্যগীতে

এবং সুরার স্রোতে দিনরাত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। লোকে বলিতে লাগিল যে হিরণ্যকশিপু কোনও কারণবশত মল্লিক-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রামের এক প্রান্তে গোয়ালা পাড়া। ঐ পাড়ায় নিতাই ঘোষ ভদ্র গৃহস্থ। এতকাল ঘোষজা সমস্ত গ্রামে বেশ সম্মানের সহিত কাটাইয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে তাহার স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা রমা দশ বৎসরের বয়সে বিধবা হইয়া পিতার আশ্রয়েই আছে। রমার বয়স এখন প্রায় উনিশ বৎসর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালা বংশকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ইহাদের রমণীরা প্রায়ই সুন্দরী হইয়া থাকে। রমাকেও সকলে সুন্দরী বলিত এবং এই সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

একদিন সকলে শুনিল যে কয়েকদিন হইতে মল্লিক ঘোষ পাড়ায় বড় ঘনঘন গমনাগমন করিতেছে। তাহার পরই রমার নাম মল্লিকের সহিত জড়িত হইয়া গেল।

প্রায়ই দেখা যায় যে এই সব ঘটনায় যাহারা প্রধান নায়ক নায়িকা তাহাদের আত্মীয়দের নিকট তাহাদের গুপ্ত প্রণয়ের সংবাদ অনেক বিলম্বে উপস্থিত হয়। রমার সহিত মল্লিকের বেশ নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, এ সংবাদ বোধ হয় নিতাই ছাড়া আর সকলেই শুনিয়াছিল। তাহার পর অবশ্য সেও জানিতে পারিল—কিন্তু অনেক বিলম্বে।

নিতাই ঘোষ প্রথমে অবশ্য কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু যখন একদিন স্বচক্ষে রমাকে মল্লিকের সহিত····· দেখিল সে যেন পাথর হইয়া গেল। তাহার পর সে হুকুম দিল যে রমা যদি বাড়ীর বাহির হয় সে তাহাকে খুন করিয়া ফেলিবে, কাহারও কথা শুনিবে না।

অভিজ্ঞ পাঠক জানেন এ প্রকার ক্ষেত্রে ঐ ভাবের শাসনে বিশেষ কোনও ফল হয় না। দুইজনের নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। এইভাবে প্রায় নয়-দশ মাস অতিবাহিত হইবার পর মল্লিকের অভিভাবকদের টনক নড়িল। তাহারা তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবিলম্বে এক বড় ঘরের সুন্দরী, শিক্ষিতা ও যুবতী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল।

অনেকে মনে করিয়াছিল মল্লিক বিবাহের কথায় বাঁকিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু সে যখন ভাবী স্ত্রীর ফোটো দেখিল এবং শুনিল যে মেয়ে নাচিতে ও গাহিতে পারে সে বিবাহে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না। অবশ্য ইহার পর সে গোয়ালা পাড়ায় আর যায় নাই।

সংবাদটা অবশ্য রমার কানেও যথাসময়ে পহুঁছিল। সে বালবিধবা। ভালবাসা পাইবার ও দিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা—ভগবান সবাইকে দিয়াছেন। রমা পূর্ণ যুবতী, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভালবাসা কাহাকে বলে সে জানিত না। অহির সহিত দেখা হইবার পর যেন সে জীবনের ধ্রুবতারাকে

খুঁজিয়া পাইয়াছিল। অহির সংস্পর্শে তাহার শূন্য জীবন যেন ষোল কলায় পূর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু যখন রমা অহির বিবাহের সংবাদ পাইল ও সঙ্গে সঙ্গে দেখিল, সে তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ একবারে বন্ধ করিয়া দিল, তখন তাহার নবনির্ম্মিত সুখের সৌধ অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল। তাহার পর লোকে শুনিল রমা পাগল হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম সে বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইত না। নিজের ঘরে দিনরাত একা বসিয়া থাকিত, কখন হাসিত, কখন কাঁদিত, কখন আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিত। আট দশ দিন এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর রমা আর বাড়ীতে থাকিত না। যখন তখন বাহির হইয়া যাইত এবং সমস্ত গ্রামময় ঘুরিয়া বেড়াইত।

প্রথম প্রথম সে অহিকে যখনই রাস্তায় দেখিতে পাইত সে দৌড়াইয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিত এবং বলিত, "বর, বর, আমার ঘরে চল। আজ যে আমাদের ফুলশয্যা।" তাহার পর অহি যে ভাবে ছাড়া পাইত তাহা আর বলিব না। কয়েকবার এইভাবে আক্রান্ত হওয়াতে সে রাস্তায় বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন রমা মল্লিকের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বাড়ীর লোক এই ভাবের উৎপাতের ভয় করিতেছিলেন বলিয়া রমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

একদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় অহি তাহার বন্ধুদের লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে এমন সময় রমা তথায় ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া অহির গলা জড়াইয়া ধরিল এবং কহিল, "এই যে আমার বর। তুমি নাকি আমায় বিয়ে ....।" তাহার কথাটা আর শেষ হইল না। অহির বন্ধু এবং অনুচরবর্গ তাহাকে এক রকম কোলে উঠাইয়া সেখান হইতে সরাইয়া দিল। কিন্তু রমা যাইবার পূর্ব্বে নিজের দুই হাতের নখের চিহ্ন অহির মুখে, নাকে এবং বুকে রাখিয়া গেল।

এই ঘটনায় অহি এমন ক্রুদ্ধ হইল যে সে বেশ পরিষ্কার ভাবে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিল যে সে যদি হারামজাদিকে খুন না করে তবে সে ডোম-বংশে জন্মিয়াছে।

উপরোক্ত ব্যাপারের দুই দিন পরে গ্রামের সকলে শুনিল যে রমা গ্রাম হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার পর সে বাড়ী হইতে বাহির হয়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সে যখন বাড়ী ফিরিল না, তখন তাহার আত্মীয়েরা যথাসাধ্য চারিদিকে তল্লাস করিল. কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না। পর দিবস প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে অহিও গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ কুৎসিৎ ইসারা করিল এবং বলিল রমা মনের সুখে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতেছে। প্রবীণেরা স্পষ্টই বলিল, "গোয়ালার মেয়ের পেটে এত বুদ্ধি কেবল কলিকালেই সম্ভবে। দেখ কেমন পাগলের ভান

ক'রে বেড়াইতেছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে টোপ ফেলাই ছিল। এখন সময় পাইয়া শীকার হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।"

রমা নিরুদ্দেশ হইবার চতুর্থ দিবসে ডুলেদের ন্যাটা সন্ধ্যার পর ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সেবার পর যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল তখন সে যাহা বলিল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই ঃ—

গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে অপরাহ্নে সে ছাগল চরাইতেছিল। ঠিক সন্ধ্যার সময় যখন সে বাড়ী ফিরিবে সে দেখে একটা ছাগল কম। খুঁজিতে খুঁজিতে সে প্রায় সিকি মাইল দূরে দাসেদের দিঘি পর্য্যন্ত যায়। পূর্ব্বকালে কি ছিল জানি না, এখন কিন্তু লোকে এই দিঘি ব্যবহার করে না। ইহার চারিদিক ঘন জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ন্যাটা ঘুরিতে ঘুরিতে দিঘির উত্তর ধারের জল পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া ছাগলকে ডাকিতে লাগিল। তখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু ন্যাটা এ প্রকার অন্ধকারে প্রায়ই ঘোরাফেরা করে বলিয়া সে অনেকটা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।

জলের ধারে উপস্থিত হইবার দুই-এক মিনিট পরে সে স্পষ্ট দেখিল দিঘির কিনারা হইতে তিন-চারি হাত দূরে জলের ভিতর হইতে তাহার রমা দিদি 'হুস্' করিয়া বাহির হইল। তাহার পর সে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জলের ভিতর যেন কিছু

সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল। তিনবার এই ভাবে দেখাইয়া রমাদিদি আবার জলের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

খ্যাটার বয়স দশ বৎসরের অধিক হইবে না। সহরের ঐ বয়সের কোনও বালক যদি সন্ধ্যার পর জনশূন্য স্থানে এই দৃশ্য দেখিত তাহা হইলে হয়ত অজ্ঞান হইয়া পড়িত। কিন্তু পাড়া-গাঁয়ের গরীবের ঘরের ছেলেরা অন্যভাবে প্রতিপালিত হয় বলিয়া অনেক রকমের আকস্মিক বিপদ আপদে একবারে অভিভূত হইয়া পড়ে না। ঐ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া সে একবার 'বাবাগো!' বলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিল, তাহার পর তীরের মত ছুটিল।

তাহার এই কাহিনী শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু ঐ রাত্রে সেই নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ব্যাপারটার অনুসন্ধান করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। চৌকিদার পর্য্যন্ত বলিল যে পরদিন প্রাতে ঐ বিষয়ের সন্ধান করা যাইবে।

গ্রামেই পুলিসের চৌকি। অতিপ্রত্যুষে চৌকিদার যখন তথায় রিপোর্ট লিখাইতে চাহিল, পুলিস অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "সকাল বেলা বোধ হ'চ্চে কোথাও দম্-টম্ লাগিয়েছিস্। এটা কি গুলির আড্ডা পেয়েছিস্ যে যা তা বলবি আর আমি লিখে ন'ব ?" শেষে অনেক বুঝাইয়া বলায় থানা হইতে এক জন পুলিস কনষ্টেবলকে চৌকিদারের সহিত দেওয়া হইল, কিন্তু ঐ 'আষাড়ে গল্প' পুলিস ডায়রিতে লেখা

হইল না। শুধু লেখা হইল—অমুক নম্বরের চৌকিদার আজ সংবাদ দিল যে এই গ্রামের দাসের দিঘির পাড়ের কোনও স্থানে একটা লাশ লুকান আছে। এই গাঁয়ের এক গোয়ালা নিতাই ঘোষের মেয়ে রমাকে কয়েক দিন হইতে পাওয়া যাইতেছে না। চৌকিদার নাকি খবর পাইয়াছে যে তাহার লাশ ঐ দিঘির ধারে আছে। অনুসন্ধানের জন্য কনষ্টেবল আলাদিনকে উহার সহিত পাঠান হইল।

বেলা প্রায় নয়টার সময় গ্রামের প্রায় ত্রিশ জন লোককে সঙ্গে লইয়া চৌকিদার ও পুলিস 'দিঘির' ধারে উপস্থিত হইল। ন্যাটা সঙ্গেই ছিল। সে রমা নির্দ্দিষ্ট স্থানটা দেখাইয়া দিল। গ্রামের কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া পুলিস অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। প্রায় বিশ-বাইশ মিনিট পরে তাহাদের সমবেত চেষ্টায় যাহা আবিষ্কৃত হইল তাহা অতি লোমহর্ষক।

দেখা গেল একটা মৃতদেহ প্রায় চার ফুট জলের নিম্নে একটা বাঁশের খোটায় আবদ্ধ। কয়েকখানা ইট কৌশলে শবের গলায় চারিদিকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একখানা বড় তোয়ালে দ্বারা মৃতদেহ ঐ খোঁটার সহিত আবদ্ধ ছিল। যাহা হউক, ঐ দেহ যখন ডাঙ্গায় আনা হইল, তখন যাহারা রমাকে জানিত, বলিল যে উহা তাহারই মৃত দেহ। কয়েক দিন জলের মধ্যে থাকায়, উহা ফুলিয়া ফাঁপিয়া অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। তজ্জন্য চেহারায় পরিবর্ত্তনও

হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও উহার পরিধেয় বস্ত্র, উহার জ্যাকেট, হাতের চুড়ি, কানের মাকড়ি, চাবির রিং প্রভৃতি দেখিয়া উহা রমার বলিয়া চিনিতে কেহ দ্বিধা করিল না।

একখানা বড় ছোরা দেহের বুকে আমূল বিদ্ধ হইয়াছিল। ইতি মধ্যে পুলিশের দারোগা উপস্থিত হইয়াছিল। সে ছোরা খানা পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার গায়ে অহির নাম খোদা। তোয়ালে খানা যে অহির তাহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। অহি যে একদিন ঐ হতভাগিনীকে 'খুন করিব' বলিয়া শাসাইয়াছিল তাহাও প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না। কথায় বলে 'ধর্ম্মের ঢাক'। ইহা বাজেনাত বাজে না। কিন্তু যখন বাজিতে আরম্ভ করে তখন বেশ সজোরেই বাজিতে থাকে। নিকটবর্ত্তী দিঘির ধারের মৃত্তিকা ভিজা ছিল বলিয়া, উহার উপর জুতার দাগ বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। পরে দেখা গেল উহা অহিরই জুতা।

অবিলম্বে পুলিস অহিকে কলিকাতা হইতে ধরিয়া আনিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। পুলিশ কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না। মল্লিকেরা জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়াও তাহাকে হাজত হইতে মুক্ত করিতে পারিল না।

অহির হাজত বাসের তৃতীয় দিবসে সে পুলিসের নিকট যে আবেদন পাঠাইল তাহাতে সকলে অত্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। উহা এইরূপ ঃ—আমার হাজত ঘরে রাত্রি দশটার পর রমার ভূত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সমস্ত রাত্রি

থাকে। আমাকে উহার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আজ হইতে আমাকে যেন লোক দেওয়া হয়। তাহারা সমস্ত রাত্রি আমার সহিত থাকিবে।”

অনেক চেষ্টার পর দুইজন কনষ্টবল্ তাহাকে দেওয়া হইল। ঐ দিন রাত্রি ঠিক দশটার পর সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, “ঐ দেখ, রাক্ষসী এসেছে। ঐ দেখ, আমার কাছে আস্‌চে। আমাকে বাঁচাও! উহাকে তাড়াইয়া দাও।” সঙ্গে সঙ্গে সে সেই ক্ষুদ্র হাজত ঘরের মধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। রক্ষীদ্বয় বলিল, “আমরা কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমাদের স্পষ্ট মনে হইল যেন কামরার মধ্যে কেহ রহিয়াছে।” ইহা কোনও মতে বন্দ হইল না। প্রত্যহ প্রহরী বদলান হইতে লাগিল, কিন্তু সকলেই বলিল যে তাহারা কাহাকেও দেখে নাই, তবে কাম্‌রার মধ্যে যে কেহ আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহার জন্য বড় বড় উকিল, ব্যারিষ্টার আসিল। তাহারা ক্রমান্বয়ে তাহাকে তালিম দিতে লাগিল—কি প্রশ্ন করিলে কিভাবে উত্তর দিতে হইবে। এমন নিপুণ ভাবে শিখান হইল যে জজ্ সাহেবের নিশ্চয়ই ধারণা হইবে যে অহি এই ঘটনায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

সেসনে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা রাত্রে মল্লিকদের প্রধান কাউন্সিল তাহাদের অর্থে আনীত এক্সা-নম্বর ওয়ান পান করিতে করিতে অহির এক খুড়াকে বলিলেন,

"এত অতি সামান্য। পাঁচ-সাতটা খুনের আসামীকে আমি ছাড়াইয়া আনিয়াছি। আমি যেমনটি বুঝাইব, জজ তাহাই বুঝিবেন। পয়সা খরচ কর, প্রথম নম্বরের জগাই মাধাইকে আমি যুধিষ্ঠির প্রমাণ করাইয়া দিব।"

কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল সকলের শিক্ষা ব্যর্থ করিয়া এবং প্রধান কাউন্সিলকে বেকুব বানাইয়া অতি জজের নিকট স্বীকার করিল যে সে রমাকে হত্যা করিয়াছে। সে কি ভাবে রমাকে ভুলাইয়া দিঘির পাড়ে লইয়া যায়, কি ভাবে তাহাকে ছোরার দ্বারা হত্যা করে এবং কি ভাবে তাহাকে জলের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখে, সমস্ত এমন ভাবে বর্ণনা করিল যে সেই যে ঐ কাজের নায়ক ইহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। শেষে বলিল, "যে দিন হইতে আমি হাজতে আছি প্রত্যেক রাত্রে রমা আমার সঙ্গে দেখা করিতেছে। তাহাকে হত্যা করিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার মুখের চোখের যে চেহারা হইয়াছিল, অবিকল সেই চেহারায় আমার কাছে আসে। সে যে কি ভীষণ চেহারা তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না,—তেমন ভয়ানক চেহারা আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। হুজুর, মনে করিবেন না আমি পাগল হইয়াছি। আমি এই যেমন আপনাকে দেখিতেছি, ঠিক এই রকম স্পষ্ট আমি তাহাকে দেখি। আপনি বলিতে পারেন যে খুনত অনেকে করে, কিন্তু হতব্যক্তি এ ভাবে হত্যা কারীর নিকটত আসে বলিয়া শোনা যায় না। আমি ইহার

কারণ জানিনা। কিন্তু আমার মনে হয় আমি তাহাকে যে রকম অমানুষিক ভাবে হত্যা করিয়াছি সে রকম হয়ত আর কেহ করে নাই। মৃত্যুর এক সেকেণ্ড পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে জানিত না আমি তাহাকে হত্যা করিব। সে জানিত আমি তাহাকে মনেপ্রাণে ভালবাসি। সে মনে করিয়াছিল, প্রেম-মিলনের জন্য আমি তাহাকে দিঘির ধারে লইয়া গিয়াছিলাম। যখন ছোরা তাহার সেই নরম বুকে প্রবেশ করে তখন সে বুঝিল যে আমি কতবড় শয়তান! আমি ....।”

অহি আর কিছু বলিতে পারিল না।

অবশ্য অহির ফাঁসির হুকুম হইল।

যে দিন ঐ হুকুম হইল সেই দিন হইতে কিন্তু রমার প্রেতাত্মা আর আসে নাই।

নারাণ ভট্টাচার্য্য ও অহি মিলিয়া রমাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। অহিত ফাঁসি কাষ্ঠে পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিল। কিন্তু আমার বোধ হয় নারানের শাস্তিও অতি কঠোর হইয়াছিল। অহির ফাঁসির পর সে কাশীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল—ভাবিল, বিশ্বনাথ পাপী, তাপী সকলকে মুক্তি দেন, সেও পরলোককে কলা দেখাইবে। কিন্তু তাহার ঐ ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। সে সঙ্গে করিয়া যা অর্থ আনিয়াছিল, তাহাতে কাশীতে কখনও অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবার কথা নয়। নারাণ কিন্তু পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিল। ইহা কিন্তু আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে সে

বাবুমির দিক দিয়াও যায় নাই, সে সুরাপান করিত না বা বেশ্যা ভক্ত ছিল না। তবে কেন যে সে সর্ব্বস্বান্ত হইল বলিতে পারি না। তাহার সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর সে পথে পথে ভিক্ষা করিত। মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার গলিত কুষ্ট হইয়াছিল।

—):*:(—

আমি তখন অমৃতসর খাল্‌সা কলেজে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক। সর্দ্দার অমরসিংহ তখন ঐ কলেজের গণিতের প্রধান অধ্যাপক। লোকটা অত্যন্ত ধর্ম্ম প্রবণ বলিয়া প্রথম হইতেই আমার সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। প্রায় প্রতিদিনই হয় সে আমার নিকট আসিত, কিম্বা আমি তাহার বাড়ী যাইতাম।

আমার অমৃতসর যাইবার প্রায় এক বৎসর পরে সর্দ্দার সাহেব একদিন স্ত্রী, পুত্র, চাকরী প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন। লোকটা যে কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহা এই একটি ঘটনা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

নিম্নের কাহিনিটি আমি সর্দ্দার অমরসিংহের মুখে শুনিয়াছিলাম। ঘটনাটি যে সত্য তাহা শুধু তিনি নন, তাঁহার গ্রামের আরও অনেকে জানে। অমৃতসরে অবস্থান কালীন আমি যখন পাঠানকোট হইয়া ধরমশালায় যাই, তখন আমি অমরসিংহের গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ঐ গ্রামের মালিক চমনলাল চৌধুরিকে ঐ কাহিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "আপনি 'বাঙ্গালী'। আপনি এ

গল্প কোথায় শুনিলেন ?" আমি অমরসিংহের নাম করাতে তিনি বলিলেন, "ইহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। আমার বয়স যখন সতর-আঠার তখন ইহা ঘটিয়াছিল। আমার পিতা তখন জীবিত। ইহার যে প্রধান নায়ক, তিন বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

এইবার আমি অমরনাথের কথায় কাহিনীটি বিবৃত করিতেছি। "জমিদার মথ্‌খনলালের মৃত্যুর পর জীবনলাল পিতার গদিতে বসিয়াছেন (চম্মনলাল এই জীবনলালের পুত্র)। প্রথমেই তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে কাহার কাহার নিকট খাজানা বাকি আছে। দেখা গেল যে সুমের সিংহের নিকট প্রায় বাহাত্তর টাকা বাকি। হুকুম হইল যে এক সপ্তাহের মধ্যে উহা আদায় না হইলে সুমের সিংহের জমি কাড়িয়া লওয়া হইবে। এই সংবাদ পাইয়া সুমের সিংহ আসিয়া জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বলিল যে তাহার বাকি খাজনার সমস্ত টাকা সে মথ্‌খনলালের মৃত্যুর বারদিন পূর্ব্বে শোধ করিয়াছে। জীবনলাল রসিদ দেখিতে চাহিলে সুমের বলিল, "বড়কর্ত্তা (মথ্‌খনলাল) রসিদ কাটিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় কি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় রসিদে দস্তখত করিতে পারেন নাই। আমাকে বলিলেন যে উহা পরে হইবে। তাহার পর তিনি পীড়িত হইয়া পড়াতে রসিদে আর দস্তখত হয় নাই।"

রসিদের কেতাব আনিয়া দেখাগেল যে রসিদ প্রস্তুত

হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে দস্তখত নাই। জীবনলাল সুমেরের কথা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার পূর্ব্ব হুকুম "সপ্তাহের মধ্যে টাকা দিতে হইবে" বহাল রহিল।

সুমের সিংহ দরিদ্র কৃষক। তাহার মাসীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সে নগদ ছাপ্পান্ন টাকা মাসীর সম্পত্তি হইতে পায়। সেই জন্য সে অনেক কষ্টে বাহাত্তর টাকা যোগাড় করিয়া তাহার খাজানা শোধ করে। এখন জমিদার পুনরায় ঐ টাকা চাওয়াতে সে যেন আকাশ হইতে পড়িল। যে জমি তাহার হাতে ছিল উহা যদি তাহার হাতছাড়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে।

জমিদার ঐ হুকুম দিবার পর সুমের সিংহ ঐ দস্তখতহীন রসিদখানা চাহিয়া লয় এবং অতি উচ্চৈস্বরে জীবনলালকে সম্বোধন করিয়া বলে, "আমি যদি সত্যসত্যই টাকা দিয়া থাকি তবে আপনার বাপের দস্তখত আমি যেমন করিয়া পারি আদায় করিব। ইহার জন্য যদি আমাকে নরকেও যাইতে হয়, আমি ভয় পাইব না।"

ইহার পর মুহূর্ত্তে যদি সে সবেগে সেস্থান হইতে অদৃশ্য না হইত, তাহা হইলে হয়ত জীবনলাল ও উহার কর্ম্মচারী দিগের হস্তে সে বিশেষ নিগৃহীত হইত। কারণ ঐ নরকের কথা উল্লেখ করিবার বেশ একটু পূর্ব্ব ইতিহাস আছে। মখ্খনলাল একজন প্রথম শ্রেণীর অত্যাচারী জমিদার ছিল। নিজের সুখ এবং লাভের জন্য সে কোনও রকম পাপকার্য্য

হইতে বিরত হয় নাই। সে যে কতলোকের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছে এবং কত রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার বোধ হয় সংখ্যা নাই। আশ্চর্য্যের কথা এই যে তাহার ঐ ভীষণ পাপের জন্য তাহাকে কখনও শাস্তি পাইতে হয় নাই। কিন্তু লোকে বলিত মখ্খনলালের জন্য ওপারে নূতন নরকের সৃষ্টি হইতেছে।

জমিদার বাড়ীর ঠিক পশ্চাতে অতি গভীর জঙ্গলময় পর্ব্বত মালা। সুমের সিংহ জমিদার বাড়ী ছাড়িয়া সোজা ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিল। সে জানিত এ সময় গ্রামের মধ্যে থাকিলে তাহাকে জমিদারের কবলে পড়িতে হইবে। ঐ সময় তাহার নিজের জীবনের উপর তিলমাত্র মায়ামমতা ছিল না। মাসীর টাকা পাইয়াছিল বলিয়া কোনও মতে বাহাত্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পক্ষে পুনরায় ঐ টাকা একত্র করা অসম্ভব। টাকা না পাইলে জমিদার যে তাহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইবে তাহা সে জানিত! ইহার পর স্ত্রী-পুত্রের সহিত অনাহারে মরিয়া যাওয়া বা পথে পথে ভিক্ষা করা ছাড়া তাহার পক্ষে অন্য কোনও পথ উন্মুক্ত ছিল না। সে যখন জঙ্গলে প্রবেশ করিল তখন তাহার মনের ভাব কতকটা এই প্রকার, 'এই জঙ্গলে যদি মরিতেও হয় তাহাও স্বীকার, কিন্তু গাঁয়ে আর ফিরিব না।'

এই জঙ্গলে সে বহুবার আসিয়াছে। কিন্তু ঐ দিন জঙ্গল প্রবেশের অর্দ্ধঘণ্টা পরে সে বুঝিল যে সে তখন যে

স্থানে আসিয়াছে, তাহা সে জীবনে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে তখন চেষ্টা করিতে লাগিল জঙ্গল হইতে বাহির হইতে। প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টা করিয়া সে বুঝিল যে ঐ রাত্রে জঙ্গল হইতে বাহির হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। তখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে একটা বড় বৃক্ষের নীচে শয়ন করিল। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহার কথায় বিবৃত করিতেছি।

"আমি শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলাম। তাহার পর যেন আমার মনে হইল কেহ আমাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া তীরের মত ছুটিল। তাহার পর যেন সে একটা সুড়ঙ্গ পথে মাটির নীচে নামিতেছে। তিন চার মিনিটের পর আমরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম ও অবিলম্বে একটা খুব বড় হলের মধ্যে নীত হইলাম।

হলটা এত বড় যে উহা আমি ঠিকমত আন্দাজ করিতে পারিলাম না। উহার ঠিক মাঝখানে একখানা চৌকির উপর বসিয়া জমিদার মখ্‌খনলাল। তাঁহার যে সকল প্রিয় কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইয়াছিল তাহারাও সকলে বসিয়াছিল। ঐ কামরার একপাশে অপরিমিত গলিত লোহা জ্বলন্ত পাথুরে কয়লার মত চারিদিকে আলো ছড়াইতেছিল। অত বড় হলে আর কোনও আলো ছিল না। কিন্তু উহার জ্যোতিতে আমি সমস্ত লোকজন ও দ্রব্যাদি স্পষ্ট দেখিতে পাইতে ছিলাম।

গলিত লোহার উপর একটা অতি বৃহৎ ডেকচি রাখাছিল।

তাহার মধ্যে কি ছিল বলিতে পারি না কিন্তু আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র বাবু মথ্খনলাল বলিলেন, "সুমের সিংহ আসিয়াছে। ইহাকে একপাত্র সরাবের সরবৎ দাও। এখনি।"

একজন লোক দৌড়াইয়া ঐ ডেক্‌চির নিকট গেল এবং একটা টিনের মগ উহার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া কোনও দ্রব্য মগ ভরিয়া উঠাইয়া লইল। যে লোকটা আমাকে জঙ্গল হইতে ঐ স্থানে লইয়া গিয়াছিল সে আমার পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় সে আমার কানে কানে মৃদুস্বরে বলিল, "ঐ ডেক্‌চির মধ্যে গলা আগুণের মত গরম পারা আছে।"

ওদিকে লোকটা মগ লইয়া আমার কাছে আসিল এবং বলিল, "এই লও। যে কেহ এখানে আসে তাহাকে এই সরাবের সরবৎ পান করিতে হয়।" আমি বাবু মথ্খনলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "আমার মৃত্যুর পর যদি এখানে আসিতাম, ঐ সরবৎ পান করিতাম। কিন্তু আমি এখনও জীবিত।" পরে পকেট হইতে রসিদখানা বাহির করিয়া বলিলাম, "বাবুজী, আমি আপনাকে বাহাত্তর টাকা দিয়াছি, কিন্তু আপনি রসিদে দস্তখত করেন নাই। রামজির দোহাই ....।"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাবু মথ্খনলাল চীৎকার স্বরে বলিলেন, "খবরদার! ও নাম এখানে লইও না। এ রাজ্যে উহাকে কেহ মানে না। দেখি তোমার রসিদ।"

একজন কর্ম্মচারী রসিদটা আমার হাত হইতে লইয়া বাবু মখ্থনলালের হাতে দিল। তিনি উহাতে কিছু লিখিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতে কলম বা পেন্সিল কিছুই ছিল না। ইহার পর রসিদটা আমার হাতে ফিরিয়া আসিল। আমি উহাতে কি লেখা হইল দেখিবার চেষ্টা করিলে বাবুজি বলিলেন, "না না, এখন নয়।" তাহার পর কি হইল ঠিক মনে নাই।

পর দিবস প্রাতে মনে হইল আমি যেন গভীর নিদ্রা হইতে উঠিয়াছি। রাত্রের ঘটনা যাহা উপরে বিবৃত করিয়াছি, এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু উহা তখনও আমি যে প্রকার স্পষ্ট ভাবে মনে করিতে পারিতেছিলাম, তাহাতে এক এক বার ভাবিতেছিলাম যে উহা স্বপ্ন হইতে পারে না। এই সময় হঠাৎ রসিদের কথাটা মনে পড়িল। পকেট হইতে উহা বাহির করিয়া দেখি—কিন্তু এ কি! রসিদে সত্যই বাবু মখ্থনলালের দস্তখত রহিয়াছে। গত কল্যকার তারিখ দেওয়া রহিয়াছে। তারিখের নিম্নে লেখা আছে—রাত্রি বারটা।"

কেহ কেহ বলেন, সুমের সিংহের ঐ কাহিনী সম্পূর্ণ অলীক—সে স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিল তাহাই সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। রসিদে দস্তখৎ পূর্ব্ব হইতেই ছিল। বক্তা অধ্যাপক অমরনাথ কিন্তু কাহিনটি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করেন। তিনি বলিলেন যে এ দেশের লোকের স্বভাব যে

যাহা তাহারা দেখে নাই তাহা তাহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করে। পাঠক মনে রাখিবেন যে অমরনাথ নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি যে আমাকে একটা আষাঢ়ে গল্প শুনাইয়াছিলেন ইহা আমি অসম্ভব মনে করি।

—):*:(—

সুলতানপুর যুক্ত প্রদেশের একটি জেলা। চাকরী জীবনে এইস্থানে এমন একটি ঘটনা দেখিবার আমার অবসর হইয়াছিল যাহা আমি এ জীবনে কখনও দেখি নাই। এই কাহিনী আমি যে ভাবে দেখিয়াছিলাম, অবিকল সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি!

গৌরিপুর সুলতানপুরের এক ক্ষুদ্র গ্রাম, সহর হইতে প্রায় সতর মাইল দূরে। এক দিন সদরের তহসীলদার আমাকে বলিল, "গৌরিপুর হইতে এক বড় তামাসার সংবাদ আসিয়াছে—সেখানে নাকি একজন হিন্দুর বাড়ীতে ভূতের বিষম উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। আপনার সময় থাকেত, চলুন একদিন দেখিয়া আসি।" আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম।

ইহার তৃতীয় দিবস বেলা প্রায় তিনটার সময় তহসীলদার, আমি ও একজন পুলিস কর্ম্মচারী, বাবু কুবেরনাথ, রওনা হইয়া চারিটার পূর্ব্বেই গৌরিপুরে উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই আমরা 'ভূতো' বাড়ীতে চলিলাম। বাড়ীর মালিক তেওয়ারিজি বিশেষ সমাদরের সহিত আমাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আমরা যে জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছি প্রকাশ করাতে তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, "আপনারা যাহা শুনিয়াছেন

তাহা সত্য। আজ চারিদিন হইতে আমার উপর এই অত্যাচার হইতেছে। প্রথম দুই দিন আমরা মনে করিয়াছিলাম ইহা কোনও বদমাইসের কাজ। সেই জন্য ততটা গ্রাহ্য করি নাই, তবে কে এই উৎপাত করিতেছে তাহা ধরিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন তাহাতে কোনই ফল হইল না তখন আমি একজন ওঝা আনিয়াছিলাম। সে বলিল যে ইহা ভুতের কাণ্ড। তাহাকে ইহার প্রতিকার করিতে বলায় সে স্বীকার পাইয়াছে, কিন্তু সে বলিল যে এ প্রকার ভুতের ব্যাপারে শনিবারই শ্রেষ্ঠ দিন। কাল শনিবার। কাল সন্ধ্যার পর সে আসিবে।"

"কখন উৎপাত আরম্ভ হয়" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "প্রত্যহ রাত্রি নয়টার পর আরম্ভ হয়।" তখন মোটে অপরাহ্ণ পাঁচটা। "আমরা ঠিক নয়টার সময় আসিব", বলিয়া চলিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে তহসীলদার ও পুলিস কর্ম্মচারী বাইশ জন কনেষ্টবল ও চৌকিদার পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঠিক রাত্রি সাড়ে আটটায় আমরা ঐ বাইশ জন লোক সঙ্গে লইয়া তেওয়ারিজির বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এই বাইশ জনের প্রত্যেককে একটা লণ্ঠন দেওয়া হইল।

অপরাহ্নে আমরা দেখিয়া গিয়াছিলাম যে তেওয়ারির বাড়ীর আসে পাশে এমন ছয়খানা বাড়ী আছে যেখান হইতে লোকে ইচ্ছা করিলে প্রস্তর বা ইষ্টক খণ্ড অনায়াসে ফেলিতে

পারে। প্রত্যেক বাড়ীতে আমরা দুই জন করিয়া লোক দাঁড় করাইলাম। তেওয়ারির বাড়ীর সম্মুখে রাজপথ, বাকি তিন দিকে ঐ ছয়খানা বাড়ী। রাজপথের অন্যদিকে বিস্তৃত খালি ময়দান। ঐ পথে চারিজন ও খালি জমিতে দুই জন লোক দাঁড়াইয়া রহিল। বাকি চারিজন লোককে সঙ্গে লইয়া আমরা 'ভুতো' বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। ছয়টা মশাল ঐ বাড়ীর মধ্যে চারিদিকে জ্বলিতে লাগিল।

বাড়ীর প্রাঙ্গনে আমরা তিনজনে তিনখানি কুর্সিতে বসিয়া ধূমপান করিতেছি এমন সময় হিন্দুস্থানি ভাষায় আমাদের সম্মুখদিক হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, "বাবুজিরা কি আজ এখানে তামাসা দেখিতে আসিয়াছেন? এত সিপাহী কেন? আমাকে গ্রেপ্তার করিবে? পারিবে?" মনে হইল শব্দটা আমাদের মাথার উপর হইতে আসিতেছে। কিন্তু কাহাকেও দেখা গেল না। গলার স্বরে বেশ স্পষ্ট বোধ হইল ইহা যেন কোনও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের। আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম তাহার আশে পাসে, এমন কি তেওয়ারিজির বাড়ীর মধ্যে কোনও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিল না। কথাগুলা এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল যে আমাদের মনে হইল বক্তা যেন আমাদের ঠিক সম্মুখে।

ইহার চারি পাঁচ মিনিট পরে কে যেন অতি সন্তর্পণের সহিত একটা খালি ঘটী পুলিস কর্ম্মচারী কুবেরনাথের কোলের উপর রাখিয়া দিল। মশাল জ্বলিতেছিল বলিয়া আমরা

চারিদিক বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম। ঘটীটা কে যে কি ভাবে রাখিল তাহার কোনও প্রকার সূত্র খুঁজিয়া পাইলাম না। এই সময় তেওয়ারিজি বলিলেন, "আজকার ঘটনা একেবারে নূতন ধরণের। অন্য দিন ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড, গাছের ডাল প্রভৃতি বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়িত। বোধ হইত যেন বাড়ীর বাহির হইতে আসিতেছে। আজ যে ভাবের ঘটনা ঘটিতেছে তাহা একদিনও হয় নাই। অত্যাচারী যেই হউক সে যেন বাড়ীর ভিতর রহিয়াছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার এক পাটি জুতা (আমি জুতা খুলিয়া বসিয়াছিলাম) অতি ধীরে ধীরে মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইয়া আমাদের সম্মুখে রক্ষিত একটি ছোট টেবিলের উপর কেহ যেন অদৃশ্য ভাবে রাখিয়া দিল। আমি শত শত বার শপথ করিয়া বলিতে পারি যে আজ আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহা এ জগতের কোনও জীবের দ্বারা সম্ভব নয়। আমরা বাইশ জন পুলিসের লোক লইয়া আটঘাট বাঁধিয়া ভূত ধরিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা তিন জনে শেষে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহার মধ্যে এমন ব্যাপার আছে যাহা আমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির অতীত।

ইহার পর আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পর দিবস শুনিলাম রাত্রে আর কোনও উপদ্রব হয় নাই।

পরদিবস তেওয়ারিজিকে বলিয়া পাঠান হইল যে,

ওঝা যখন আসিবে আমাদিগকে যেন সংবাদ পাঠান হয়। ওঝার কার্য্য প্রণালী আমরা দেখিতে চাই। তেওয়ারিজি আমাদিগকে ঘটনা স্থলে উপস্থিত থাকিবার জন্য স্বয়ং আসিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বলিলেন যে, ঠিক সন্ধ্যার পর কাজ আরম্ভ হইবে।

যথা সময়ে আমরা উপস্থিত হইয়া দেখি বাড়ীর একটা বড় দালানে প্রায় তের চৌদ্দ জন লোক বসিয়া আছে। ওঝা একজন বৃদ্ধ মুসলমান। সে ও একটি পনের ষোল বৎসরের বালক ঐ দালানের এক কিনারায় বসিয়া আছে। ওঝা এবং সমবেত লোকদিগের মধ্যে প্রায় দশ বার হাত স্থান খালি পড়িয়াছিল।

আমরা উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ওঝা নিজের কাজ আরম্ভ করিল। প্রথমে সে কতকগুলি সর্ষপ আমাদের উপর ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "প্রেত যদি দুষ্টাত্মা হয়, তাহা হইলে সময় সময় দর্শকদিগের উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করে। যাহাতে এ প্রকার ঘটনা না হয় সেই জন্য আমি মন্ত্রপূত সর্ষপ ছড়াইলাম।"

ইহার পর ওঝা সঙ্গের বালককে সম্মুখে বসাইয়া অনুচ্চ-স্বরে (বোধ হয়) কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে তাহার চক্ষুর উপর ফুৎকার দিতে লাগিল। তিন চারি মিনিট পরে মনে হইল বালক জ্ঞান শূন্য হইয়াছে, কারণ ইহার পর সে (বালক) পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল।

এইবার ওঝা বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?" তিনবার এই প্রশ্ন করিয়া যখন কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, ওঝা এক আঁজলা জল (বোধ হয় মন্ত্রপূত করিয়া) লইয়া বালকের অঙ্গে ঢালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বালক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এই আর্ত্তনাদের স্বর শুনিয়া মনে হইল যেন উহা কোনও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ। পনের ষোল বৎসরের বালকের কণ্ঠ হইতে ঐ প্রকার স্বর আমার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

জল পর্ব্বের পর ওঝা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে ? এইবার বলিবি না আরও সাজা দিতে হইবে ?" বালক এবার বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের স্বরে বলিল, "আমি হামিদ উল্লা সওদাগরের স্ত্রী।"

ওঝা। কোন্ হামিদ উল্লা ? যাহার সরাফের দোকান ?

বালক। হাঁ।

ওঝা। এ বাড়ীতে কেন আশ্রয় লইয়াছিস্ ?

বালক। এ বাড়ীর একটা ছোট ছেলে জুমার (শুক্রবার) দিন আমার কবরের উপর প্রস্রাব করিয়াছিল। আমি সহজে এ বাড়ী ছাড়িব না।

অনুসন্ধানে জানা গেল যে গত শুক্রবারে তেওয়ারির সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র তাহার এক বড় ভায়ের সহিত বেড়াইতে গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর একস্থানে প্রস্রাব করিয়াছিল।

ওঝা বলিল, "কাজটা খুব অন্যায় হইয়াছে কিন্তু ঐ

শিশুর কাজে তোমার এত রাগ করা উচিত হয় নাই। এখন বল কি করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও।" বালক প্রথমে বিড় বিড় করিয়া কি বলিল বোঝা গেল না, তাহার পর স্পষ্টস্বরে বলিল, "আমি ছয়মাস এ বাড়ী ছাড়িব না।" ওঝা প্রথমে মিনতি করিল। কিন্তু উহাতে যখন কোনও ফল হইল না তখন সে কতকগুলা সর্ষপ হাতে লইয়া বলিল, "তুই যদি এখনই এ বাড়ী ছাড়িয়া না যাস্ তোকে কঠোর শাস্তি দিব।" তখন বালক বলিল, "আমার কবরের উপর তিন দিন মৌলুদশরীফ করাইতে হইবে।"

তেওয়ারিজি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন।

আমারা পরে জানিয়াছিলাম যে, যে স্থানে বালক প্রস্রাব করিয়াছিল তাহা প্রকৃতই হামিদ উল্লার স্ত্রীর কবর। এই ঘটনার প্রায় সাত বৎসর পুর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

পাঠক মনে রাখিবেন প্রথম দিন তেওয়ারিজির বাড়ীতে গমনের অব্যবহিত পরেই আমরা যে শূণ্য বাণী শুনিয়াছিলাম তাহা বৃদ্ধা রমণীর মনে হইয়াছিল। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঐ রমণী যে ভাষায় কথা বলিয়াছিল তাহা যে উর্দ্দু (হিন্দি নয়) ইহা আমাদের সকলকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গলার স্বর যে একজন বৃদ্ধা স্ত্রী লোকের সে বিষয়ে আমাদের কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

তৃতীয় ভাগ।

পুনর্জ্জন্মবাদ

পুনর্জন্মবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাপ ও পুণ্য।

আমাদের প্রাচীন ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে মানুষের মৃত্যুর পর যে তাহাকে আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ইহা বিশেষ স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহার পর শ্রুতি উপনিষদে ইহাকে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে পুরাণে এ সম্বন্ধে নানাবিধ কাহিনী বিবৃত করিয়া বিষয়টাকে অতি সরল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"ইমানি ক্ষুদ্রানি অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ) দেহাভিমানী, ক্ষুদ্রকর্ম্মা, মায়ামোহমুগ্ধ মানবই বারবার জন্ম গ্রহণ করে।

উপরে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে যে মত দিলাম, হিন্দু শাস্ত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই উহার প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই—অর্থাৎ যাহারা ইহলোকে পুণ্য পথে বিচরন করে না, তাহারাই আবার মৃত্যুর পর এখানে ফিরিয়া আসে।

কোন হিন্দুই উপনিষদের ঐ মতের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবে না। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, পাপপুণ্য জিনিসটা কি ? যদি আমরা নিরপেক্ষ বিচার করি, তাহা হইলে স্বীকার করিতে বাধ্য যে 'পাপ' ও 'পুণ্য' যে কি তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে বলা যায় না। একটা ডাকাতের দল যদি বলপ্রকাশে কাহারও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং ঐ লুণ্ঠন কার্য্যে যদি কাহারও প্রাণহানি হয়, তাহা হইলে ঐ লুণ্ঠন ও হত্যাকে লোকে গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করিবে। এ দিকে একজন রাজা যদি আর একজনকে আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয় এবং তাহার জন্য যদি শত শত লোকের প্রাণনাশ হয়, কেহই তাহাকে পাপ বলিবে না। এমন কি আমরা গীতায় দেখিতে পাই যে পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জ্ঞাতি হত্যা করিবার প্ররোচনা দিতেছেন। পাণ্ডবেরা অপর পক্ষের প্রত্যেক সেনাপতিকে (ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ) অন্যায় ভাবে হত্যা করেন, কিন্তু তাহা যে পাপ ইহা বেদব্যাস আদৌ স্বীকার করেন নাই। হিন্দুর আর এক অবতার রামচন্দ্র নিতান্ত অন্যায় ভাবে বালী ও মেঘনাদকে হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে কেহ পাপ বলিয়া মনে করে না। পশুকে দেবতার নামে হত্যা করিয়া আহার করিলে হিন্দুর নিকট তাহা পাপ হয় না, অথচ বৌদ্ধ ও জৈন মতে সামান্য কীটকে হত্যা করিলে তাহা মহাপাপ। এই ভাবের আরও বহুতর উদাহরণ দ্বারা আমরা দেখাইতে পারি

যে এই জগতে পাপ ও পুণ্যের বিচার করা অতি কঠিন কাজ। হিন্দু একটা কাজ করিলে তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই জন্য তাহাকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আর অন্য ধর্ম্মের লোক সেই কাজ করিলে কোনও সাজা পাইবে না। ভগবানের দরবারে পাপ ও পুণ্যের এ ভাবে বিচার হইতে পারে না। যদি এ ভাবে বিচার হয়, তাহা হইলে, হিন্দুর, মুসলমানের, খ্রীষ্টানের ও বৌদ্ধের ভগবানকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবে না। সমস্ত জীবের ভগবান যদি এক হয়, তাহা হইলে একের পাপ বা পুণ্যকে সকলের পাপ বা পুণ্য বলিয়া মানিতে হইবে।

বিশেষ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে পাপ ও পুণ্যের প্রকৃত সংজ্ঞা (definition) নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। বহুদিন পূর্ব্বে আমি একখানি ইংরাজি মাসিকে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প পড়িয়াছিলাম। বিষয়টা সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া আমি উহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

প্রাচীন ইংলণ্ডে সম্রাট্ অষ্টম হেনরীর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি জীবনে কামরিপুর বশীভূত হইয়া বহুবার বিবাহ করিয়াছিলেন। সেকালে ইংলণ্ডের রাজা যদি এক পত্নী ত্যাগ করিয়া অন্য পত্নী গ্রহণ করিতেন, তাঁহাকে রোমের পোপের অনুমতি লইতে হইত। হেনরী পত্নী ত্যাগে পোপের অনুমতি না পাইয়া গায়ের জোরে

এক আইন পাশ করাইয়া ল'ন যে, সম্রাট্ পত্নী ত্যাগ করিতে চাহিলে পোপের আদেশের কোনও প্রয়োজন নাই।

হেনরীর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে লরেন্স নামক এক সাহেবের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয় যে সে স্ত্রী জীবিত থাকিতে একটি কুমারী ও তিনটি বিধবার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে। জজ সাহেব যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার ঐ পাপ ও অন্যায় কাজের জন্য তাহাকে কঠিন শাস্তি কেন দেওয়া হইবে না, সে বলিল, "আমাদের সম্রাটকে আমরা দেশের সর্ব্বপ্রধান ভদ্রলোক (The First Gentleman of the Realm) বলিয়া থাকি। তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন যে পুরুষ মানুষ যথেচ্ছা ব্যভিচার করিতে পারে এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে ভগবানের কানুন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সম্রাট্ আজীবন ব্যভিচার করিয়া আসিতেছেন কিন্তু তাঁহাকেত কেহ ইহার জন্য অনুযোগ করে না। আমার কাজের জন্য যদি আপনি আমায় শাস্তি দেন তাহা হইলে প্রথমে সম্রাটকে সাজা দেন।"

জজ সাহেব লরেন্সকে সামান্য শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার Judgment-এর (রায়) এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "আসামী নিজের সাফাইর জন্য যাহা বলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এ দেশে সম্রাট্ কানুনের উপর (তখন ইহাই ছিল। ইহার পর সম্রাট্কে পর্য্যন্ত কানুনের অধীন

করা হইয়াছিল) সেই জন্য এ বিষয়ে আমি কিছু করিতে পারি না।”

অনেক দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যাহা সত্য তাহাই পুণ্য এবং যাহা অসত্য তাহাই পাপ। সত্য কি? এই জগতে যাহা নিত্য—অর্থাৎ যাহা আবহমান কাল হইতে আছে এবং থাকিবে, তাহাই সত্য। আমরা যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করি, তাহা হইলে জানিতে পারি যে এই জগতে পশু, পক্ষী, কীট, নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছি সমস্তই অসত্য, কারণ ইহারা সকলেই পরিবর্ত্তনশীল। ইহাদের মধ্যে নিত্য কেহই নয়। এই মুহূর্ত্তে আমি যাহা দেখিলাম, পর মুহূর্ত্তে সেটি আর ঠিক সেই ভাবে থাকে না, পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে। জগতের সমস্তই যখন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন সমস্তই অনিত্য বা মিথ্যা।

তবে কি সংসারে সত্য কিছুই নাই? আছে। যে মহাশক্তির দ্বারা এই বিশ্বের সমস্তই প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এ জগতে উহাই একমাত্র সত্য কারণ উহা অপরিবর্ত্তনীয়—অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়। যে কার্য্য দ্বারা আমরা ক্রমে ক্রমে সেই মহাশক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারি, তাহাই পুণ্য। মহাশক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া, বা মৃত্যুর পর উচ্চতর লোকে গমন করা, বা পুনরায় এ জগতে ফিরিয়া না আসা একই কথা। কথাটা আরও সরল ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পুনর্জ্জন্মের মাত্র এইটি পথ দেখিতে পাওয়া যায়। যে পথে গমন করিলে জড়দেহ নাশের পর আত্মাকে পুনরায় এই জড়জগতে বা অন্য কোনও হীনতর জড়জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় তাহাই পুনর্জন্মের পথ; উহাই আমাদিগকে ঐ মহাশক্তি (ঈশ্বর) হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।

আমরা এই পুস্তকের প্রথম ভাগে এবং ইহলোক ও পরলোকে বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছি যে, মুক্তজীব ছাড়া সমস্ত মানুষকেই মৃত্যুর পর প্রেত লোকে যাইতে হইবে। পাপ পূণ্যের প্রভেদ বিষয়ে এ পারে হয়ত নানা প্রকার মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু ওপারে (প্রেতলোকে) এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র মতভেদ হয় না। প্রেতাত্মাকে উচ্চতর লোকে যাইতে হইলে যে পথ অবলম্বন করিতে হইবে সে বিষয়ে ওপারের সকলেই একমত। ঠিক সেই পথটিতে না চলিলে প্রেতাত্মাকে পুনরায় এ পারে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে যাহা দ্বারা আমরা প্রেতলোক হইতে উচ্চতর লোকে গমন করিতে পারি এবং যাহা দ্বারা আমাদিগকে আর এ পারে ফিরিয়া আসিতে না হয় তাহাই পুণ্য। কিম্বা যে কার্য্য দ্বারা মানুষকে আবার এপারে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহাই পাপ।

প্রত্যেক প্রেতাত্মা (সে আমাদের হিসাবে যতবড় পাপীই হউক) যাহাতে উচ্চতর লোকে যাইতে পারে সে বিষয়ে ওপারে যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যখন দেখা

যায় যে প্রেতাত্মা এপারের আকর্ষণ কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না, তখন সে আবার ফিরিয়া আসে।

জীবাত্মার প্রেতলোকে থাকিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা প্রেতচক্রে এমন অনেক প্রেতের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যাহারা বহুদিন ঐ লোকে বাস করিতেছে। আবার এমন প্রেতের কথা শুনিয়াছি যাহারা ওপারে গমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ পারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

পুনর্জন্ম গ্রহণের বিষয়ে আমার ইহলোক ও পরলোক পুস্তকে আমি এ সম্বন্ধে প্রেতাত্মাদিগের নিকট যাহা শুনিয়াছি এবং যাহা আমি ঐ পুস্তকে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে, নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে প্রেতাত্মাদের এইমত (পুনর্জন্ম বিষয়ে) সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

"মানবের অপরিতৃপ্ত বাসনা সকল মৃত্যুর পর আত্মার সঙ্গে সঙ্গে পরপারে যায় এবং সেখানেও যদি ঐ সকল অপূর্ণ কামনার বিনাশ না হয়, তাহা হইলে আত্মাকে অপর জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ সকল বাসনার তৃপ্তি সাধন করিতে হয়।" (১ পৃষ্ঠা)।

আমরা মরজগতে যে যে বাসনার দাস থাকি, সেই সকল বাসনা জড়দেহ নাশের পর সূক্ষ্মদেহের সহিত এ পারে (পরলোকে) আসে। উহারা ও পারে (ইহলোকে) যেমন

প্রবল থাকে এ পারেও (পরলোকে) ঠিক সেই ভাবে থাকে। উহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। লোকে সমস্ত অপূর্ণ বাসনা লইয়া প্রেতলোকে আসে, কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার কোনও উপায় থাকে না, কারণ জড়দেহ না থাকিলে বাসনা পরিতৃপ্ত করা যায় না। কাজে কাজেই তাহাকে আবার ওপারে (জড়লোকে) ফিরিয়া যাইতে হয়। (১৪৭ পৃষ্ঠ)।

"আমাদের প্রেতলোকে অতৃপ্ত বাসনাধারী বা কলুষিত মনের যে সকল আত্মা আছে, তাহারা একত্রে বাস করে না। তাহারা কি ভাবে কোথায় বাস করে তাহা আমি (বক্তা একজন প্রেতাত্মা) ঠিক জানি না।.......... .... তবে আমাদের মধ্যে এমন আত্মা আছেন যাঁহারা ঐ সকল অপকৃষ্ট আত্মাদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে উন্নতপথে আনিবার চেষ্টা করে। শুনিয়াছি, ইহাদের মধ্যে যাহাদিগকে উন্নত পথে আনা যায় না, তাহাদিগকে হয় তোমাদের পারে (ইহলোকে) কিম্বা অপর কোনও নিম্নতর লোকে পাঠান হয়।" (১৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)।

"মানুষ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতিকে ছাড়িয়া যখন এ পারে (পর পারে) আসে, তখন প্রায়ই তাহাদের জন্য ভয়ানক ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ইহা নূতন দেশ। তাহার পক্ষে এখানে সবই নূতন। এইজন্য প্রায়ই মানুষ এখানে আসিয়া ওপারের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বদা ওপারের তাহার পরিচিত ও আত্মীয়দিগের নিকট ঘুরিতে

ফিরিতে থাকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যাহাদের এ ভাবটা চলিয়া যায় তাহাদের ওপারে ফিরিবার (পুনর্জন্মের) আর ভয় থাকে না। কিন্তু মন কিছুতেই যাহাদের শান্ত হয় না, তাহাদিগকে আবার ফিরিতে হয় (পুনর্জন্ম লইতে হয়)। (১৯৫ পৃষ্ঠা)।

"আমাদের লোকে জীবাত্মার যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের লোকের চিন্তা থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসনার লোপ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঊর্দ্ধতর লোকে যাইতে পারে না। যখন সে উপরে চলিয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে সে জড়জগতের চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। (১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)।

উপরে আমরা প্রেতাত্মাদিগের যে সকল কথা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে পাঠক বেশ স্পষ্ট দেখিবেন যে পুনর্জন্ম বিষয়ে তাহারা পাপ বা পুণ্যের কথা আদৌ উল্লেখ করে নাই। সকল আত্মাই এই কথা বলিয়াছে যে যাহারা জড়জগতে ফিরিয়া যাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে না পারে, তাহারাই আবার ফিরিয়া আসে। তাহাদের উক্তির মধ্যে কোনও স্থানে 'পাপ' 'পুণ্যের' উল্লেখ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন না। একটা লোক হয়ত ইহলোকে বহুতর লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। সমস্ত জীবন এই ভাবের কাজ করিতে করিতে যদি তাহার মন এমন হইয়া যায় যে হত্যা ও অপহরণ না করিলে সে মনে বিষম অশান্তি অনুভব করে,

তাহা হইলে মৃত্যুর পরও তাহার মনে উহার পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে। পরলোকে যদি সে ঐ বাসনাদ্বয়ের হাত হইতে কোনও মতে মুক্তিলাভ না করে তাহা হইলে তাহাকে আবার ঐ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অথচ এই লোকের মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি হত্যা ও অপহরণ করিবার বাসনা মন হইতে একবারে মুছিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর এপারে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। (আমাদের হিসাবে) মহাপাপ করিয়াও যদি কেহ মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্যায় প্রবৃত্তি সকল দমন করিতে পারে তাহাকে ওপারে কোন প্রকার শাস্তি গ্রহণ করিতে হয় না—অর্থাৎ প্রবৃত্তি দমনই মহাপুণ্য। ইহা যে করিতে পারে তাহাকে, আর এপারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। প্রেতাত্মাদিগের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এইমত আমাদের এ কালের দার্শনিক ও স্মার্ত্তেরা কতদূর মানিবেন বলিতে পারি না। আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহাই বিবৃত করিলাম।

আমার ইহলোক ও পরলোক পুস্তকে আমি চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি যে মৃত্যুর পর জীবাত্মাকে পুনরায় আমরা এপারে আনিতে পারি ও তাহার সহিত অনায়াসে কথোপকথন করিতে পারি। এই সকল আত্মা সর্ব্বত্র এই কথা বারবার প্রচার করিয়াছে যে মৃত্যুর পর অনেককে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তুমি আমি যাহাকে পাপী বলি তাহাকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, ইহা কোনও আত্মা স্বীকার করে

না। তাহারা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছে যে, যে লোক এই জড়জগতের সমস্ত ভোগের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করিয়া ওপারে যাইতে পারে, তাহাদিগকে আর এখানে ফিরিয়া আসিতে হয় না। এখন পাঠক নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করুন। যাহারা ওপারে গিয়াছে পুনর্জন্ম বিষয়ে তাহাদের কথা বিশ্বাস করিব না ওপারে না গিয়াই যাহারা শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পুনর্জন্ম সম্বন্ধে মত প্রচার করিয়াছে বা করিতেছে ?

আজ প্রায় চল্লিশ্ বৎসর কাল প্রেততত্ত্ব আলোচনার ফলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রেতচক্রে উপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রেতাত্মারা পরলোক সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য পাই নাই। উহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—

জড়দেহ নাশের পর সাধারণতঃ প্রেতাত্মা প্রেতলোকে গমন করে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহার অতৃপ্ত বাসনাগুলি দূরীভূত না হয়, তাহাকে প্রেতলোকে থাকিতে হয়। ঐ গুলি নিশ্চিহ্নভাবে মিটিয়া গেলে ঐ আত্মা উচ্চতর লোকে গমন করে। যাহার ইহা হয় না, সে সর্ব্বদা ইহলোকে অদৃশ্যভাবে কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার পর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে ইহলোকে বা আরও নিকৃষ্টতর লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

আমাদের প্রবৃত্তি বা কামনা সকলের সম্পূর্ণ ভাবে দমন না হইলে আমরা পুনর্জন্মের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি

না। আমাদের কোন কোন প্রাচীন শাস্ত্রেও এই মতকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করা হইয়াছে।

মুক্তিকোপনিষতের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ইহাতে রামচন্দ্র বক্তা। এক স্থানে তিনি বলিতেছেন:—"যেরূপ পুত্রকাম যজ্ঞ দ্বারা পুত্রলাভ করা যায়, সেই প্রকার নিদিধ্যাসন দ্বারা সমাধিলাভ করিবার পর জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। সকল প্রকার বাসনার ক্ষয় হইলে এই অবস্থা লাভ হয়। বাসনা ক্ষয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ, এবং মনোনাশ এই তিন প্রকার সাধনা এক সঙ্গে অভ্যাস করিলে মুক্তিলাভ করা যায়। সম্যক আলোচনা এবং সত্যকে আশ্রয় করা—এই দুই উপায়ে বাসনা বিনষ্ট হয়। আশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, সংসার চিন্তা ত্যাগ করিলে, এবং এই দেহ একদিন নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে সতত এইরূপে চিন্তা করিলে বাসনা নিবৃত্ত হয়। প্রথমে সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি শুভবাসনা আকাঙ্ক্ষা করিবে। তাহার পর শুভ বাসনাও পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ভগবত্তত্ত্বে বিলীন হইবে। পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভের ইহাই একমাত্র উপায়।"

পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে মুক্তিকোপনিষতের মতের সহিত প্রেতচক্রে উপস্থিত প্রেতাত্মাদিগের মতের বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, শ্রীরামচন্দ্র পুনর্জ্জন্ম প্রসঙ্গে পাপ ও পুণ্যের কথা আদৌ উল্লেখ করেন

নাই। এই পরিচ্ছেদের প্রথমে আমরা পুনর্জন্মের বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সহিত মুক্তিকোপনিষতের মতের পার্থক্য আছে। আমাদের শাস্ত্রেই আছে, "নাসৌ মুনির্যস্থ মতং ন ভিন্নং।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্মান্তর সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় দর্শনের মত

মার্কণ্ডেয় পুরাণে সুমতি পিতাকে নিজের পূর্ব্ব-জন্মের যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা জন্মান্তর সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অতি সুন্দর প্রমাণ। ঐ বর্ণনার অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"আমি বহুবার শত্রু, মিত্র কলত্রের সহিত মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, বিবিধ প্রকার মাতা ও বিবিধ প্রকার পিতা দর্শন করিয়াছি। * * * * * হে পিতঃ! আমি এই ভাবে ভয়সঙ্কুল সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিয়া শেষে আপনার নিকট আসিয়া মোক্ষলাভের জ্ঞানলাভ করিয়াছি।"

এইবার আমরা পুনর্জ্জন্মবাদের সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আমাদের ন্যায় দর্শন হইতে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব ঃ—

১। শিশুর জন্মের পরই তাহার স্তন্যপানের প্রবৃত্তি জন্মে। পূর্ব্বের অভ্যাস ব্যতীত এই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব মানিতেই হইবে যে, ঐ শিশু ইহার পূর্ব্বে আরও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দেখা যায় জীব ক্ষুধিত হইলেই

আহার করিতে ইচ্ছা করে। আহার করিলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, ইহা তাহার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার। ইহা তাহাকে কেহ শিখায় নাই। ক্ষুধা অনুভব করিলেই শিশু বা পশু-পক্ষীর শাবকেরা মুখ ব্যাদন করিয়া আহার্য্য দ্রব্যের ইচ্ছা প্রকাশ করে। হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, লৌহ যেমন অয়স্কান্তের দিকে অভ্যাস ব্যতীতও আকৃষ্ট হয়, শিশুও পুর্ব্ব সংস্কার ব্যতীতও আহারের অভিলাষ প্রকাশ করে। এ আপত্তি কিন্তু যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ শিশু আহারের ইচ্ছা কেবলমাত্র ক্ষুধার সময় প্রকাশ করে, অন্য সময় নয়। লৌহকে কিন্তু অয়স্কান্তের নিকট উপস্থিত করিলেই উহা আকর্ষিত হয়, ইহাতে তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা নাই।

২। এই সংসারে কেহই বীতরাগ হইয়া জন্মে না। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু রাগ, আনন্দ প্রভৃতির চিহ্ন প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাকে কেহ এই সকল মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেয় না, তথাপি সে উহা প্রকাশ করে। ইহা হইতে স্পষ্টই মনে হয় ইহা তাহার পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার। আনন্দিত হইলেই হাসিতে এবং কষ্ট হইলেই কাঁদিতে তাহাকে কে শিখাইল?

৩। পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার ভিন্ন সুখ-দুঃখাদির বৈষম্যের কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংসারে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র। এরূপ বৈচিত্র হয় কেন? এখানে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতে এই যে জন্ম

হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁ নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফলাফল। দুইটি শিশু ঠিক একই মূহুর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিল। দেখা যায়, উহাদের মধ্যে একজন হয়ত রাজা হইল, অন্যজন হইল পথের ভিখারী। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল না মানিলে এই পার্থক্যের আর কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যদি বল ঈশ্বর লীলাময়, তিনি নিজের লীলা প্রকাশের জন্য এই পার্থক্যের সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে বলিতে হয় ঈশ্বর একদেশদর্শী বা একচোখো। জীবকে কষ্ট দিয়া তিনি তামাসা দেখিতে ভালবাসেন। কিন্তু কোন ঈশ্বরবাদীই ঈশ্বরের বিষয়ে এই প্রকার ধারণা করিবে না। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে জীব জন্মের পর হইতেই যে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে ইহা তাহার পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মত

আত্মা অমর, আত্মার বিনাশ নাই, ইহা পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সমস্ত জাতিই মানে। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে দুইটি বিষয়ে মত ভেদ দৃষ্ট হয়, ঃ—(১) মৃত্যুর পর আত্মা পুনরায় এ জগতে আসিয়া আমাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয় করিতে পারে কি না। (২) মৃত্যুর পর আত্মার আবার এই জগতে জন্ম হয় কি না।

এ পর্য্যন্ত আমরা প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। মৃত্যুর পরে আত্মার ফিরিয়া আসিবার বিষয়ে পাশ্চাত্য জগত আজকাল অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন। এই বিষয়ে আমি নিজে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি তাহা কিছু কিছু এই পুস্তকেও বিবৃত করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশেও অনুসন্ধান অল্পবিস্তর আরম্ভ হইয়াছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন এই বিশ্বাস (আত্মার মৃত্যুর পর আমাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারে) ঘরে ঘরে প্রচার হয়। যে দিন দেশের সকলে এই বিষয়ে আস্থা স্থাপন করিবে সেই দিন হইতে

আমাদের মধ্যে মৃত্যু ভয় আর থাকিবে না। কাহারও নিকট আত্মীয়ের দেহত্যাগের পর আর সে শোক করিবে না, কারণ তাহারা এখন ঐ আত্মীয়কে ইচ্ছামত আহ্বান করিতে, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বা দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।

আত্মাকে আহ্বান করা আজকাল এত সহজ হইয়া পড়িয়াছে যে, ভাল গুরু পাইলে অতি অল্প দিনের মধ্যে এই বিদ্যা আয়ত্ত্ব করা যায়।

কিন্তু পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে সভ্য জাতিদিগের মধ্যে এখনও মতভেদ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্ম পুস্তকে ইহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। পাদ্রিরা বলে, মৃত্যুর পর আত্মাকে প্রেতলোকে থাকিতে হয়। যখন প্রলয় হইবে, তখন সমস্ত আত্মাকে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। তিনি প্রত্যেক আত্মার ইহজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে তাহাকে পুরস্কার বা সাজা দিবেন। কিন্তু ইহার পর আত্মা কি ভাবে পুরস্কার বা শাস্তি পাইবে তাহার উল্লেখ বাইবেলে নাই। পাদ্রিরাও এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারে না। সংসার যদি লয়ই পাইল, তবে সাজা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, ঠিক বুঝা যায় না।

মুসলমানের ধর্ম্ম মত এই বাইবেলের ভিত্তির উপর স্থাপিত। সেইজন্য তাহাদের মতও অনেকটা এই ভাবের। তাহারা বলে, আত্মা মৃত্যুর পর ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি আত্মার কর্ম্মফল অনুসারে তাহার পুরস্কার বা শাস্তির

ব্যাবস্থা করেন। কিন্তু পুনর্জ্জন্মের কথা মুসলমানেরা স্বীকার করে না।

দুইটা মতই প্রায় এক প্রকার। খ্রীষ্টানদের বিচারের দিন প্রলয়ের পর হইবে, কিন্তু মুসলমানদের মতে বিচারের দিন মৃত্যুর পরই হয়। কিন্তু পুনর্জ্জন্ম কেহই স্বীকার করে না।

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে পুনর্জ্জন্ম সম্পুর্ণ ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, 'পুনর্জ্জন্ম হয়' ইহা প্রমাণ করিবার চাক্ষুষ প্রমাণ আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত উপস্থিত করা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে এক আধটা কাহিনী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু উহা কতদূর প্রমাণসহ তাহার অনুসন্ধান বড় একটা হয় না।

আমি যখন যুক্ত প্রদেশের জালোন (ওরই) জেলায় অবস্থান করিতেছিলাম, তখন তত্রস্থ ডিপুটি কলেক্টর বাবু রাম গোপাল মিশ্রের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। শুনিলাম প্রায় ছয় বৎসর যাবত তিনি পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি সাতটি এমন ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যাহাতে নিতান্ত নাস্তিককেও (পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে) বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে পুনর্জ্জন্ম আছে। আরও প্রমাণ সংগৃহীত হইলে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। এই জন্য ঐ সাতটি কাহিনীর একটিও আমি এই পুস্তকে সন্নিবেশ করি নাই।

জালোনে আমি পাঁচ বৎসর ছিলাম। এই সময়ের প্রায় তিন বৎসর কাল বাবু রাম গোপাল ও আমি মিলিতভাবে পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। ইহারই ফল আমি নিম্নে অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার প্রত্যেক ঘটনা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার পর অন্যত্র আমি এ বিষয়ে যে সকল কাহিনী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম তাহা ভবিষ্যতে অন্য পুস্তকে প্রকাশ করিব।

চতুর্থ ভাগ

পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯২৬ মার্চ্চ। একদিন সংবাদ পাইলাম যে, কানপুর সহরের তেইশ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে একটি মেয়ে আছে, যাহার পূর্ব্বজন্মের অনেক কথা মনে আছে। এক রবিবারে আমরা দুই জনে কার, এক্কা ও পদব্রজে বেলা প্রায় দশটার সময় ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। মেয়েটি এক সামান্য গৃহস্থ মুসলমান ঘরের। ঐ সময় উহার বয়স পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। তখনও পর্য্যন্ত সে সমস্ত কথা বেশ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না।

আমরা অগ্রেই সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম বলিয়া বাড়ীর কর্ত্তা বেশ সমাদরের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিল। অবিলম্বে মেয়েটিকে আনা হইল। প্রথমে বোধ হয় ভয়ে ও লজ্জায় সে তাহার বাপের কোলে মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিল। এই প্রকার ব্যাপারের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। দুই চারিখানা বিস্‌কিট্ ও দুই একটা মিষ্ট কথায় তাহার মুখে কথা ও হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাধিক নানা প্রকার প্রশ্নের পর আমরা তাহার নিকট যাহা জানিতে পারিলাম তাহা এই :—

এক দিন এই মেয়েটি স্বপ্নে একখানি বাড়ী ও উহার মধ্যে দুই তিন জন লোক দেখিতে পায়। পর দিবস প্রাতে ঐ স্বপ্নের কথা সকলকে বলে এবং ইহাও বলে সে কোনও সময় ঐ বাড়ীতে বাস করিত। (তাহার যথাসাধ্য বর্ণনা দিল)। ঐ বাড়ীতে কত লোক থাকিত তাহাও কিছু কিছু বলিল। তাহার সাধ্যমত গ্রামের বর্ণনা দিল। ঐ গ্রামের দুই চারিজন লোকের বর্ণনা করিল। যে বাড়ীতে সে থাকিত তাহার মালিকের ও তাহার দুই পুত্রের নাম বলিয়া দিল।

মেয়েটির মুখে গ্রামের বর্ণনা যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা উহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। যে গ্রামে সে এইবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার আশে-পাশে প্রায় এক-শত গ্রামের চৌকিদার ও মুখিয়ার (গ্রামের প্রধান ব্যক্তি) সাহায্যে প্রায় আড়াই মাস সন্ধানের পর আমরা যেন সফল মনোরথ হইলাম। এই গ্রামের চৌদ্দ মাইল দূরে ফুলপুরগ্রাম। বালিকার বর্ণনার সহিত মিলাইয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, এই ফুলপুর গ্রামের কেশো প্রসাদের ঘরে সে পূর্ব্ব জন্মে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

আমাদের এই অনুমান সত্য কিনা দেখিবার জন্য আমরা দুই জনে ঐ কন্যাকে (ইহার নাম রুমিয়া) ও উহার পিতাকে সঙ্গে লইয়া ঐ ফুলপুরে উপস্থিত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আমরা গোপন অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে

রুমিয়া ইহার পূর্ব্বে নিজের গ্রাম ছাড়িয়া আর কোথায়ও যায় নাই। রুমিয়া নিজেও সেই কথা বলিল।

রুমিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিল যে ফুলপুরের এক কোণে একটা মাটির বৃহৎ 'টিলা' (ঢিপি) আছে। আমরা সেই টিলার নিকট আসিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। ডিপুটি সাহেব রুমিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই টিলাটা কখনও দেখিয়াছ কি?" রুমিয়া কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "অনেকবার। আমি এইখানে অনেক খেলিয়াছি।"

ডিপুটি। যে বাড়ীতে তুমি থাকিতে তাহার রাস্তা কি তোমার মনে আছে?

বালিকা দুই হাতে তালি দিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিল, তাহার পর বলিল, "খুব মনে আছে। চল না আমি তোমাদের চিনাইয়া দিতেছি।" সে দ্রুতবেগে অনেকটা অগ্রসর হইল। খানিকটা গিয়া সে হঠাৎ গতিরোধ করিল এবং বলিল, "এ রাস্তাটা এমন ছিল না।"

ঐ গ্রামের মুখিয়া আমাদের সঙ্গে ছিল। মিশ্রজি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্থানটার কি কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে?" মুখিয়া বলিল, "জি হুজুর। ছাব্বিশ বৎসর পুর্ব্বে এখানে একটা বাড়ী ও ছোট বাগান ছিল। উহা ভাঙ্গিয়া সোজা সড়ক হইয়াছে।"

সামান্য অনুসন্ধানের পর রুমিয়া আবার পথের সন্ধান

পাইল এবং অনতিবিলম্বে একটা দ্বিতল বড় বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে বাড়ীর সম্মুখে একটা খালি জায়গায় এক বৃদ্ধ একখানা চারপাইয়ের উপর বসিয়াছিল। তাহাকে ডিপুটি সাহেবের আগমন সংবাদ দেওয়াতে সে অতি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আসিয়া ডিপুটি ও আমাকে এক এক লম্বা সেলাম দিয়া দণ্ডায়মান রহিল। রুমিয়া তাহাকে দেখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং হর্ষোৎফুল্লভাবে বলিল, "এই যে আমার বাবুজি!"

বৃদ্ধ একটু স্থির হইলে (ডিপুটির আগমন এবং রুমিয়ার সহসা আক্রমণে বেচারা যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল) আমরা সকলে সেই খোলা জায়গায় উপবিষ্ট হইলাম। রুমিয়া কিন্তু বৃদ্ধের সঙ্গ ছাড়িল না।

শুনিলাম বৃদ্ধের নাম কেশো প্রসাদ (ইহার নাম আমরা রুমিয়ার নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম)। তাহার এক কন্যা ছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ইহার পর ডিপুটি সাহেব যথাসাধ্য সংক্ষেপে আমাদের ঐ গ্রামে আসিবার কারণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "এই মেয়েটি বলিতেছে যে, পূর্ব্ব জন্মে এ আপনার কন্যা ছিল।" তাহার পর নানা প্রকার অনুসন্ধানের পর রুমিয়া যে কেশো প্রসাদের বাড়ীতে জন্মিয়াছিল তাহার এমন সব অকাট্য প্রমাণ আমরা পাইলাম যে, উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। উহার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। কেশোপ্রসাদের মৃত কন্যার যে বর্ণনা রুমিয়া দিল তাহা যে সত্য কেশোপ্রসাদ স্বীকার করিল। ঐ কন্যার নাক, চোখ, মুখ, চুল প্রভৃতি কি প্রকার ছিল, কি কি গহনা পরিত, কি ভাবে কথা বলিত, মেজাজ কি প্রকার ছিল প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া গেল, তাহা আসলের সহিত অবিকল মিলিয়া গেল।

২। ঐ কন্যা কি প্রকারের কাপড় পরিতে ভালবাসিত বাড়ীর যে ঘরে সে থাকিত তাহার বর্ণনাও ঠিক মিলিয়া গেল।

৩। কেশোপ্রসাদের এক বিধবা ভগিনীর (তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে) বিষয়ে সে যে যে সংবাদ দিল তাহা যে সমস্তই সত্য তাহা কেশোপ্রসাদকে স্বীকার করিতে হইল।

৪। ঐ মৃত কন্যার একটা কাঠের হাত-বাক্স ছিল। রুমিয়া যে শুধু তাহার সঠিক বর্ণনা দিল তাহা নয়। ঐ বাক্সের ভিতরের ডালায় সে একটি হাঁস আঁকিয়া রাখিয়াছিল, সে সংবাদ পর্য্যন্ত রুমিয়ার নিকট পাওয়া গেল। কেশোপ্রসাদ স্বীকার করিল যে উহা সত্য।

উপরের কাহিনীটি যে পূর্ব্ব জন্ম-স্মৃতির অকাট্য প্রমাণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। রুমিয়া নিজের ক্ষুদ্র জীবনে গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। ইহারও আমরা প্রমাণ পাইয়াছিলাম যে কেশোপ্রসাদ কখনও রুমিয়ার গ্রামে যায় নাই।

এই কাহিনীর মধ্যে দুইটি ব্যাপারের কোনও সন্তোষ জনক কারণ আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। প্রথমটি এই যে কেশোপ্রসাদ হিন্দু কায়স্থ। তাহার কন্যা মৃত্যুর পর কি জন্য মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? হিন্দু হয়ত বলিবে, কন্যা কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার অধোগতি হইল। মুসলমান কিন্তু বলিবে যে ঐ কন্যার পুণ্যের জোর ছিল, তাই সে হিন্দু হইয়াও পরে মুসলমানের ঘরে গিয়াছিল। আসল ব্যাপার কিছুই বুঝা গেল না।

দ্বিতীয়তঃ—প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কেশোপ্রসাদের কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু রুমিয়ার বয়স মোটে পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ বৎসর। এই পঁচিশ বৎসর কাল ঐ আত্মা কোথায় ছিল? কেহ কেহ বলিতে পারে যে, এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাহার আর এক জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। রুমিয়ার জন্মের পূর্ব্বে তাহার যদি আর এক জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ঐ জন্মের কথা মনে রাখিল না কেন? অথচ ঐ জন্মের আগের কথা তাহার মনে পড়িল।

আমার বিশ্বাস রুমিয়ার ঠিকপূর্ব্ব জন্ম কেশোপ্রসাদের বাড়ীতে হইয়াছিল—অর্থাৎ কেশো প্রসাদের কন্যারূপে মৃত্যুর পর তাহার আত্মা প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল প্রেতলোকে ছিল। এই দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পর ঐ আত্মা রুমিয়া হইয়া জন্মিয়াছিল।

ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে যদি কোনও হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে পরজন্মে হিন্দুর ঘরে না মুসলমানের ঘরে জন্মিতে চায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বলিবে 'হিন্দুর ঘরে'। দশবিশ লক্ষ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ একই উত্তর হইবে। অথচ কেশো প্রসাদের কন্যা পর জন্মে মুসলমানের ঘরে জন্মিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা পর জন্মে কি ভাবে, কি বংশে জন্মিবে তাহাতে উহার কোন স্বাধীনতা নাই বলিয়াই মনে হয়। স্বাধীনতা থাকিলে কেশো প্রসাদের কন্যা কখনও মুসলমানের ঘরে জন্মিতে চাহিত না।

পূর্ব্ব জন্ম স্মৃতির বিষয়ে যতগুলি ঘটনা আমরা জানি তাহাতে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় আমরা প্রত্যেক ঘটনায় লক্ষ্য করিয়াছি :—

১। আমরা ইহা সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পূর্ব্ব জন্মের বসত বাটী বা কোনও আত্মীয়ের দেখা পাওয়া যায় ততদিন পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে পড়ে না। আমরা যতগুলি কাহিনী স্বচক্ষে ঘটিতে দেখিয়াছি সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

২। মৃত্যুর পর আত্মাকে পরপারে পুনর্জ্জন্মের জন্য অপেক্ষা করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কাহাকে এক বৎসর, কাহাকে দুই বৎসর, কাহাকেও বা অতি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে হয়। আমি যতগুলি ঘটনা জানি তাহাতে

অপেক্ষা করিবার সময় এক বৎসর হইতে একাত্তর বৎসর পর্য্যন্ত পাইয়াছিলাম। হয়ত অনেক আত্মাকে অধিকতর সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে হয় বা হইয়াছে। এই হ্রাস বৃদ্ধির কারণ আমরা জানি না।

৩। হিন্দুর আত্মা মুসলমানের ঘরে ও মুসলমানের আত্মা হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। স্পষ্ট বোধ হয় এ বিষয়ে আত্মার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে আত্মার পুনর্জ্জন্ম বিষয়ের সমস্ত ব্যাপার এমন এক মহাশক্তি পরিচালনা করিতেছে যাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই। পুনর্জ্জন্ম ঈশ্বরের অস্তিত্বের অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৯২৮ নবেম্বর। যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ দক্ষিণ-দিকে যেখানে মিলিত হইয়াছে, ঠিক সেই সীমার উপর দুইটি ছোট দেশী রাজ্য অবস্থিত। উহার একটির নাম রামপুরা। জালোন হইতে উহা প্রায় বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

একবার বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে জালোন, এলাহাবাদ এবং কানপুরের বহুতর ভদ্রলোককে রামপুরার রাজ-বাড়ীতে আহ্বান করা হইয়াছিল। ঐ সময় আমি, আমার এলাহাবাদের এক হিন্দুস্থানী বন্ধু, তাঁহার ছয়বৎসর বয়সের পুত্র এবং জালোনের এক উকিল বন্ধু বেলা প্রায় দুইটার সময় রামপুরা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। এলাহাবাদের বন্ধু ও তাহার পুত্রের নাম লালতা প্রসাদ ও কামতা প্রসাদ।

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমরা রামপুরায় উপস্থিত হইলাম। ইহাকে একটি ছোট সহর বলা যাইতে পারে—লোক-সংখ্যা প্রায় চারি হাজার। রাজার প্রস্তর দুর্গ গ্রামের প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া আছে। এই প্রকার সুরক্ষিত, বৃহৎ সুদৃঢ় কেল্লা এ অঞ্চলে আর নাই।

আমার কাহিনী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি যে লালতা প্রসাদ ও তাঁহার পুত্র আজ পর্য্যন্ত রামপুরায়

কখনও আসেন নাই। কিন্তু আমাদের কার গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কামতা প্রসাদ বলিয়া উঠিল, "চাচাজি (পশ্চিমে অনেক স্থানে পিতাকে 'চাচাজি' বলা হয়) এই গাঁ আমি খুব চিনি। গাঁয়ের এক ধারে রাজা সাহেবের এক বড় কেল্লা আছে। আমি উহার মধ্যে অনেকবার গিয়াছি।"

বালক যে রামপুরা কখনও দেখে নাই তাহা আমি জানিতাম। তাহার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া লালতা প্রসাদ আমার দিকে ও আমি তাঁহার দিকে বিস্ময় স্তম্ভিত ভাবে দেখিতে লাগিলাম। দুই এক সেকেণ্ড পরে বন্ধু ইংরাজীতে বলিলেন, "ব্যাপার কি! হঠাৎ কি এ পাগল হইয়া গেল? রামপুরায় আসা দূরের কথা, সে কখনও উহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। আচ্ছা তুমিত কেল্লা কয়েক বার দেখিয়াছ। পরীক্ষা করিয়া দেখত উহার কেল্লা দেখিবার কথা সত্য কি না।"

ইহার পূর্ব্বে আমি ঐ কেল্লা বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়াছিলাম। এমন কি উহার নক্সা পর্য্যন্ত আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। লালতা প্রসাদের কথায় আমি বালককে দুর্গের বিষয় নানা প্রকার প্রশ্ন করিলাম—কেল্লার ফটক কি প্রকারের, ফটকের পর কি আছে, রাজা সাহেবের বাড়ী কয়তালা প্রভৃতি। ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুমাত্র অনৈক্য বাহির করিতে পারিলাম না।

রাজা সাহেবের মহল (প্রাসাদ) কয় তালা জিজ্ঞাসা

করাতে উত্তর পাইলাম, "তিন তালা।" অথচ আমি দ্বিতলই দেখিয়াছিলাম। আমি যখন তাহার ভুল সংশোধন করিতে চাহিলাম, সে বলিল "বেশ, মাটির নীচে যে তহখানা আছে। তিন তালাইত।" রাজবাড়ীতে মৃত্তিকার নীচে এক তালা আছে আমি জানিতাম না। আমাদের সঙ্গে জালোনের যে উকিল যাইতেছিলেন তিনি বলিলেন, "রাজবাড়ীর প্রায় ত্রিশ ফুট নিম্নে এক তালা আছে।" বালকের এই অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরা তিন জনে স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলাম।

পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল যে আমরা তিন জনে সহকারী ম্যানেজার (ম্যানেজার এক জন সাহেব) সাহেবের বাড়ী যাইব। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে যাইবেন। তদনুসারে আমরা তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া কার হইতে অবতরণ করিলাম। এই সময় সহকারী ম্যানেজারের পাশের বাড়ী দেখাইয়া কামতা প্রসাদ চীৎকার করিয়া বলিল, "চাচাজি, এ বাড়ী আমি খুব চিনি।"

এতক্ষণ আমি মনে মনে কামতা প্রসাদের কথাই আলোচনা করিতেছিলাম। আমার স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল যে উহার রাজবাড়ীর জ্ঞান পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহার আর কোনও প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমার মনে হইয়াছিল যে যদি ভাল করিয়া সন্ধান লওয়া যায় তাহা হইলে বালক তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতির

আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারে। সে যখন ঐ বাড়ী দেখিয়া 'আমি চিনি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল তখন যেন আমার অনুমান সত্য বলিয়া মনে হইল।

এই সময়ে সহকারী ম্যানেজার উপস্থিত হওয়াতে, আমার অনুমান সঠিক কি না জানিবার জন্য আমি তাঁহাকে পাশের বাড়ীর মালিককে কিম্বা ঐ বাড়ীর আর কোনও লোককে আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। আমার এই অদ্ভুত অনুরোধে তিনি কি মনে করিলেন জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মালিককে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে আমি কামতা প্রসাদকে ঐ বাড়ীর বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। কেল্লার বিষয়ে যেমন সমস্ত তথ্য মিলিয়া গিয়াছিল এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। আট নয়টা প্রশ্নের উত্তরে মোটে দুইবার সে বলিল, "জানি না—ঠিক মনে নাই।"

ইহা যে পূর্ব্ব-জন্ম স্মৃতি তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রে বালক দুইটি স্থান মাত্র চিনিতে পারিল—সম্ভবতঃ সে যদি রামপুরায় কয়েক দিন থাকিয়া সহরের অন্যান্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে হয়ত আরও স্থান চিনিতে পারিত। আশ্চর্য্যের কথা এই যে সে এখানকার কোনও লোককে চিনিতে পারিল না।

কিন্তু না, ইহা আশ্চর্য্যের কথা মোটেই নয়। আমি যতগুলি পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতির ঘটনা দেখিয়াছি সব স্থানেই দেখি

একটা নির্দ্দিষ্ট বাড়ী বা কোনও লোক না দেখা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-জন্মের কথা মনে হয় নাই। কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু ইহাই যেন নিয়ম।

রামপুরায় কামতা প্রসাদ হয়ত পূর্ব্ব জন্মের আত্মীয় কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, সেইজন্য পূর্ব্ব জন্মে কাহার বাড়ীতে জন্মিয়াছিল তাহা উহার মনে হয় নাই।

ইহার মধ্যে আর একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ের যতগুলি ঘটনা আমরা দেখিয়াছি সব স্থানেই বালক বা বালিকা পূর্ব্ব জন্মে যাহাদের বাড়ীতে জন্মিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিবার পর পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে করিতে পারিয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের কোনও বন্ধু বা পরিচিত লোককে দেখিয়া কেহ পূর্ব্ব জন্মের কথা জানিতে পারিয়াছে, ইহা আমরা আজ পর্য্যন্তও শুনি নাই। এ বিষয়ে আরও অনু-সন্ধান হইলে হয়ত আরও অনেক নূতন কথা জানা যাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাধামতি কাশীতে আমাদের পাড়ায় বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স দশের অধিক হইবে না। কোলের ছেলে বলিয়া রাধামতি বোধ হয় সকল সন্তান অপেক্ষা ইহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি বিধবা।

আমাদের সংসারের সহিত ইহাঁর অনেক দিনের পরিচয়। তিনি প্রায়ই তাঁহার ছোট ছেলে বিলাস কুমারকে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। এক দিন কিন্তু তাঁহার এই নয়ন পুত্তলি সামান্য পীড়ায় চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনায় রাধামতির কি অবস্থা হইল তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা বোধ হয় অনুমান করাই সহজ। প্রায় এক মাস কাল তাঁহার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি দিন রাত্রি পাড়ার লোককে নিয়মিত ভাবে শুনিতে হইয়াছিল।

যত বড় শোকই হউক, সময় সমস্ত ভুলাইয়া দেয়। প্রায় এক মাস পরে রাধামতির হৃদয় বোধ হয় অনেকটা শান্ত হইল, কারণ ঐ ক্রন্দন ধ্বনি ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিল। তবে তিনি যে হৃদয়ে ভীষণ আঘাত পাইয়াছেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিত।

বিলাসের মৃত্যুর প্রায় চারি মাস পরে এক দিন রাধামতি ঠাকুরাণী আমায় বলিলেন, "কাল ভোর রাতে সেই হতভাগা (বিলাস) স্বপনে আমায় দেখা দিয়ে গিয়েছে।" আমি বলিলাম, "ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি যখন দিন রাত তাহার কথা ভাব তখন স্বপনে তাহাকে দেখাত খুবই স্বাভাবিক।"

রাধামতি। তা নয় বাবা! প্রথম প্রথম তাহাকে যতটা ভাবতাম এখনত বোধ হয় তার সিকিও ভাবি না। কিন্তু তখনত সে কখনও দেখা দেয় নাই। চারি মাস পরে দেখা দিলে কেন? মনে রেখ বাবা, এ ভোরের স্বপন। এ কখনও মিথ্যে হয় না। আর সেত শুধু দেখা দিতে আসেনি। একটা বড় খপর আমায় দিয়ে গেল।

আমি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা, মাসি মা?" রাধামতি বলিলেন, "এখনও সে কথা মনে হ'লে গা শিউরে ওঠে। হতভাগা আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, 'মা,—আমি জানি তুমি আমায় হারিয়ে বড় কষ্টে আছ। কিন্তু আমার ত কোন হাত নেই। এখন আমি আবার মানুষ হয়ে জন্মাব।' তার পর কোথায় কার বাড়ী সব ব'লে দিলে। আমি বাবা কথা কইতে গেলুম, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় জন্মাবে কিছু ব'লে

গেল কি ?” ঠাকুরাণী বলিলেন, “সব ব’লে গেছে বাবা।” তিনি গ্রাম ও জেলার নাম বলিলেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, “কার বাড়ীতে জন্মিবে তাহা কিছু বলিয়াছে কি ?”

রাধামতি। বলিয়াছে বৈ কি। গাঁয়ে কে রজনী মিত্তির আছে, তা’রই বাড়ী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ভাবের ঘটনা শুনিলে আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু এখন আমার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহা জানি না বা দেখি নাই তাহা অসম্ভব বলিতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

পর দিন হইতে আমি অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম এবং জানিতে পারিলাম যে ঐ জেলায় প্রকৃতই ঐ নামের এক গ্রাম আছে। তথায় সত্য সত্যই রজনী মিত্তির আছে। বলা বাহুল্য রাধামতি ঐ গ্রামের নাম পর্য্যন্ত কখনও শুনেন নাই, অতএব রজনী মিত্রের নাম জানা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

যে রাত্রে বিলাস মাকে সংবাদ দিয়া যায়, তাহার প্রায় দশ মাস পরে মিত্র মহাশয়ের এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

তাঁহার পরলোকগত পুত্র যে সত্য সত্যই রজনী মিত্রের বাড়ী পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা আমি রাধামতিকে বলি নাই। ইহা যদি তিনি শুনিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মালদহ জেলার সেই গ্রামে উপস্থিত হইতেন। ইহা অবশ্য

মিত্র মহাশয় বা রাধামতি কাহার পক্ষে সুখের কথা হইত না।

এই কাহিনীতে একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে ব্রাহ্মণ-পুত্র বিলাস পর জন্মে কায়স্থের ঘরে জন্ম লইয়াছিল। ইহাতে বেশ স্পষ্ট বোধ হয় যে—আমাদের জন্ম ও মৃত্যু কতকগুলি অজ্ঞাত, কিন্তু অলঙ্ঘনীয়—নিয়মের অধীন। এখন আমরা এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে ভাবে প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় অল্প দিনের মধ্যে এই সকল নিয়ম অনেকটা আমাদের বোধগম্য হইবে।

ইহার মধ্যে আর একটা ভাবিবার কথা আছে। বিলাসের মোট দশ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ইহার চারি মাস পরে সে মাকে সংবাদ দিয়া যায় যে তাহার পুনর্জ্জন্ম হইবে। এই অল্প বয়সে সে যে কি উপায়ে তাহার এ জগতে ফিরিয়া আসিবার কথা জানিতে পারিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে মনে হয় যে পরলোকগত আত্মাকে আবার ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় সে বোধ হয় পুনর্জ্জন্মের পূর্ব্বেই জানিতে পারে যে তাহাকে আবার ফিরিতে হইবে। এই সংবাদ কে দেয় বা কি ভাবে দেওয়া হয় তাহা আমরা এখন পর্য্যন্ত জ্ঞাত নই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কানপুর সহরের প্রায় উনিশ মাইল দক্ষিণে এস্‌লামপুর গ্রাম। গ্রামটিকে ক্ষুদ্রই বলা উচিত, কারণ ইহার অধিবাসীর সংখ্যা দুই শত ঘরের অধিক হইবে না। গ্রামবাসীরা অধিকাংশ দরিদ্র—দুই চারি বিঘা জমির উপর নির্ভর করিয়া কোনও রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

উহাদের মধ্যে চারি পাঁচ ঘর লোকের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল। লছমন্ প্রসাদ দুবে উহাদের মধ্যে একজন। ইহাঁর কানপুর সহরে শস্যের একটি বড় আড়ত আছে। দুবেজি নিজেই এই দোকানে বসিতেন, কিন্তু আমাদের বর্ণিত সময়ে অধিক বয়স হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালী প্রসাদ নিয়মিত ভাবে দোকানে বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কালী প্রসাদের বয়স তখন প্রায় সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বৎসর।

এই সময়ে কালীপ্রসাদের প্রথম পুত্র তারাপ্রসাদের বিবাহ কানপুরে হয়। এই বিবাহের সময় তাঁহার নবপুত্র-বধূর বয়স সাত বৎসর—নাম লছমিয়া। বধূর অল্প বয়স শুনিয়া আপনারা হয়ত চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার বিন্দু-

মাত্র কারণ নাই। প্রথমতঃ—সে সময় সারদা আইন পাস হয় নাই। পাস হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না। এই আইন পাশ হইবার পরও আমরা জানি যে ছয় সাত বৎসরের অনেক কন্যার বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য আমরা সংযুক্ত প্রদেশের কথা বলিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ—সারদা আইন পাস হইবার পুর্ব্বে সংযুক্ত প্রদেশে, বিশেগতঃ ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে অতি অল্প বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইত। কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা সংযুক্ত প্রদেশের পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক বিবাহ দেখিয়াছি যেখানে বর ও কনের বয়সের সমষ্টি সাত আট বৎসরের অধিক নয় (অর্থাৎ বরের বয়স চারি পাঁচ বৎসর এবং কনের তিন চারি বৎসর)।

বিবাহ অবশ্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর বর পক্ষীয়েরা যে দিন কনেকে লইয়া এস্‌লামপুরে গমন করিল, বর কর্ত্তার বন্ধু ভাবে আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইল। মোটে উনিশ মাইল পথ। বেলা দুইটার সময় রওয়ানা হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা বরের গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

বরের দল যখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, বর ও কনেকে এক তান্‌জামে (ইহা অনেকটা রিক্‌সার মত। ডুলি বা পাল্‌কির মত বেহারারা বহিয়া লইয়া যায়) বসাইয়া দেওয়া হইল। বরের পিতা, কন্যার এক বড় ভাই ও আমি তান্‌জামের ঠিক পাশে পাশে যাইতে লাগিলাম।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবার বোধ হয় দুই তিন মিনিট পরে ক'নে হঠাৎ বড় ভাইকে লক্ষ্য করিয়া বেশ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভেইয়া, এ গাঁ আমি বেশ ভাল করিয়া চিনি। খানিক আগে রাস্তার বাঁ দিকে রাজাসাহেবের কোঠি।" এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে. রাস্তার বাম দিকে এক ধনী ক্ষত্রিয়ের বাড়ী। কোনও সময়ে ইহাঁরা বিস্তৃত জমিদারীর মালিক ছিলেন বলিয়া এখনও লোকে ইহাদিগকে 'রাজাসাহেব' বলিয়া উল্লেখ করে।

কনের বড় ভাই এই গ্রামে নবাগত বলিয়া গ্রামের কোনও সংবাদ রাখিত না। ভগিনীর এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিশেষ বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি ও বরের পিতাও কম বিস্মিত হই নাই। আমরা বুঝিতে পারিলাম না যে, এই গ্রামে সম্পূর্ণ নবাগতা সাত বৎসরের মেয়ে ঐ রাজাসাহেবের বাড়ীর সংবাদ জানিল কি প্রকারে? আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এই গ্রামে কখনও আস নাই। তুমি এ গ্রামের সংবাদ জানিলে কেমন করিয়া?"

লছমিয়া বেশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আসিনি! এ গাঁ আমি বেশ ভাল করিয়াই চিনি। এই রাস্তার খানিক আগে তেমাথা পথ আছে। সেখানে একটা কুয়া আছে, ঐ কুয়ার পাশে একটা বড় ময়দানে রবি ও বুধবারে হাট বসে।"

বর-কর্ত্তা ও আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম—

লছমিয়া যাহা যাহা বলিল তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু এ সব সংবাদ সে জানিল কেমন করিয়া ? সে জীবনে কখনও এখানে আসে নাই, এমন কি ইহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই।

লছমিয়া যে হাটের কথা বলিল তাহারই এক পাশে বর কর্ত্তার বাড়ী। প্রায় এক বিঘা জমির উপর বেশ বড় বাড়ী, আগাগোড়া পাকা।

এই বাড়ীর সম্মুখে আমাদের দল উপস্থিত হইবামাত্র বহুতর লোক আসিয়া আমাদের সম্বর্দ্ধনা করিল। ইহার মধ্যে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার বয়স ঠিক কত বলিতে পারি না, কিন্তু বরের বাড়ীর নিকট থাকেন বলিয়া বর পক্ষের সকলেই তাঁহাকে চিনিত এবং বয়সে বৃদ্ধ বলিয়া সম্মান করিত। আমি বরের বাড়ী কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছি বলিয়া তিনি আমার নিকটও অনেকটা পরিচিত ছিলেন। জাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'ঠাকুর সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিত।

এই বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র লছমিয়া যেন বেশ উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিল, "এই যে নানাজি !" আমরা বাধা না দিলে সে হয়ত তান্‌জাম্ হইতে লাফাইয়া পড়িত। তাহাকে বাধা দেওয়াতে সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং নিজের ভাইকে বলিল, "ভেইয়া, ইনি আমার নানা। তুমি ইহাকে চিনিতে পারিতেছ না ?" ভ্রাতা বেকুবের মত ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বয়স বার তের বৎসরের

অধিক হইবে না। যদি অধিক হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই নব বিবাহিতা ভগিনীর অদ্ভুত আচরণে লজ্জিত হইত। এই সময় বরের পিতা আমাকে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "বাবুজি, এই কন্যার কি কোনও পীড়া আছে? এই গ্রামে প্রবেশ করার পর হইতে ইহার কাজ আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমার মনে হয় ইহার পাগলামির ছিট্ আছে।"

কন্যার পিতা আমার বিশেষ বন্ধু। বলিতে কি তাঁহারই বিশেষ অনুরোধে আজ আমি কন্যার সহিত আসিয়াছি। কালীপ্রসাদের ঐ কথায় আমি বিশেষ শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম এবং বলিলাম, "কন্যাকে আমি খুব ভাল করিয়াই জানি। তাহার কোনও পীড়া নাই। তাহার কথার ভাবে বোধ হইতেছে ইহা পুনর্জ্জন্মবাদের এক ঘটনা। আমি এ বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতেছি। আপনি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইবেন না।"

বিশেষ অনুসন্ধানের পর দেখিলাম ইহা পুনর্জ্জন্মবাদের এক অকাট্য প্রমাণ। পূর্ব্বজন্মে লছমিয়া যে ঠাকুর সাহেবের দৌহিত্রী ছিল ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে ঠাকুর সাহেবের কন্যার (অর্থাৎ লছমিয়ার পূর্ব্বজন্মের জননীর) যে প্রকার বর্ণনা দিল তাহাতে সকলেই বলিল লছমিয়া যাহা বলিতেছে তাহা সত্য। এতদ্ব্যতীত ঠাকুর সাহেবের বাড়ীর এবং প্রধান প্রধান কাম্‌রার বর্ণনা প্রায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল।

ঠাকুর সাহেব বলিলেন, "আমার ঐ নাতির সতের বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। ঐ সময় তাহার বয়স প্রায় তের বৎসর ছিল।"

পাঠক! দেখিবেন এ ঘটনাটিতেও আমরা সেই পুরাতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি ঃ—পূর্ব্ব জন্মে যদি সতের বৎসর পূর্ব্বে উহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে দশ বৎসর কাল সে কোথায় ছিল? পূর্ব্ব জন্মে সে ঠাকুরের ঘরে (ক্ষত্রিয়ের) জন্মিয়াছিল, এ জন্মে সে ব্রাহ্মণের ঘরে আসিল কেন? উত্তরের ভার পাঠক পাঠিকার অনুমানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা এই স্থানে তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিম্নের কাহিনী মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বমুখে বিবৃত করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে, তাঁহার মত মহাত্মা যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করি। তাঁহার বিবৃত ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বলিয়াই মনে করি। সেইজন্য এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করিলাম। ঘটনাটি গোস্বামীজির ভাষায় বর্ণনা করিলাম।

"শান্তিসুধা আমার নিকট আত্মীয়া। ইহাকে আমি নিজের কন্যার মত ভালবাসিতাম। যথাসময়ে তাহার একটি ছেলে হইল। ইহার জন্মের পূর্ব্বদিন রাত্রে আমি ঐ আগন্তুক পুত্রের পূর্ব্ব-জন্ম বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারীর কুঞ্জে একটি বলরাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহাঁর নাম দাউজী। এই আগন্তুক শিশু ঐ মূর্ত্তির পূজক ছিল। ঐ পূজক একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন। তাঁহার গুরু একজন সিদ্ধ-মহাপুরুষ ছিলেন। পূজক আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং সর্ব্বদা গুরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

একদিন গুরু ও শিষ্য বসিয়া আছেন, এমন সময় কয়েকটি স্ত্রীলোক গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যতক্ষণ আশ্রমে ছিলেন, গুরু তাঁহাদের সহিত মন খুলিয়া গল্প করিলেন। শিষ্যের নিকট গুরুর এই ব্যবহার অত্যন্ত নিয়ম বিরুদ্ধ মনে হইল।

ঐ স্ত্রীলোকেরা চলিয়া যাইবার পর গুরুর এক বন্ধু সাধু ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ইনিও একজন সিদ্ধ-পুরুষ। ইনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শিষ্যের গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিয়াই তাঁহার বন্ধুর প্রশংসা আরম্ভ করিলেন।

শিষ্য রমণী সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুর প্রতি বিশেষভাবে বিরক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া বলিল, "আপনি যাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, তাঁহার গুণের কথা কি জানেন? আজ কয়েকজন যুবতীর সহিত যে ব্যবহার করিলেন……।" গুরুর বন্ধু এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই শিষ্যকে ধমক দিয়া বলিলেন, "ছি, ছি, গুরুকে কি এই ভাবে নিন্দা করে।" শিষ্য বলিল, "কেন বলিব না! সত্য কথা বলিতে আমি ভয় পাই না।" বন্ধু বলিলেন, "তুমিত অতি ক্ষুদ্র লোক। হাতী কত খায়, কত হজম করে, তাহা তুমি সামান্য ইঁদূর হইয়া কি বুঝিবে?" শিষ্য সক্রোধে বলিল, "অমন হাতী আমি ঢের ঢের দেখিয়াছি।" এইবার গুরুর বন্ধু বিশেষ কূপিতভাবে বলিলেন, "বটে, আচ্ছা, তোমাকে মৃত্যুর

পর আবার ফিরিয়া আসিয়া ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। তখন বুঝিবে "গুরু কত বড় হাতী।"

এইবার গুরু বন্ধুর নিকট হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "ও ছেলে মানুষ, উহাকে মাপ কর।" উহাঁর বন্ধু বলিলেন, "তুমি খুব জান আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কাটিবে না। তবে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি ইহার জন্ম সাধু প্রকৃতির লোকের সংসারে হইবে এবং অল্প দিনেই ইহার কর্ম্মভোগ শেষ হইবে।"

ঐ ঘটনার প্রায় বাইশ বৎসর পরে ঐ শিষ্যের মৃত্যু হয়। প্রেতলোকে প্রায় এক বৎসর কাল থাকিবার পর এ শান্তি-সুধার গর্ব্ভে আসিয়া জন্মিয়াছে। এই বালক ছয় বৎসর বয়সে জড়দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।"

আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে এই বালক যোগীজন-সুলভ অনেক প্রকারের আসন বিশেষ নির্ভুল ভাবে করিতে পারিত। বৃন্দাবনের অনেক দেবদেবী ও সাধু মহাত্মার কথা সে এমন ভাবে বর্ণনা করিত যে, মনে হয় যে সে যেন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। অথচ তাহার এই জীবনে সে বৃন্দাবনে কখনও যায় নাই। ঠিক ছয় বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট

প্রেত-লোক সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রেতের বৈঠকে আগত প্রেতাত্মাদিগের নিকট আমরা পরলোক সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা অতি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম। একই বিষয়ে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রেতাত্মা ভিন্ন প্রকারের বর্ণনা দিয়াছে, আমরা তাহা বিবৃত করি নাই। প্রেত-লোকের যে সকল বিষয়ে সকল প্রেতাত্মা একমত, আমরা কেবল সেইগুলিই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ভারতের যে সকল মহাত্মা সাধনা বলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের পদপ্রান্তে বসিয়া আমি পরলোক সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জ্ঞাত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। পরলোক সম্বন্ধে প্রেতাত্মা-দিগের নিকট হইতে যে সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলাম এবং যাহা এই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কয়েকটি ঐ সকল মহাত্মার দ্বারাও সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হইয়াছে। এই জন্য পরলোকের এই সকল সংবাদ আমরা পাঠকগণের নিকট নিঃশঙ্কভাবে উপস্থিত করিলাম।

১। জড়জগতে প্রায়ই লোকে মনে করে যে, যে সময় কাহারও মৃত্যু হয় (অর্থাৎ মানুষের সূক্ষ্মদেহ তাহার জড়দেহকে

চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া যায়) সে সময় তাহাকে অতি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহাকেই লোকে মৃত্যু যন্ত্রণা বলে। প্রেতাত্মারা কিন্তু এই যন্ত্রণার কথা আদৌ স্বীকার করে না। তাহারা বলে, লোকে যেমন নিদ্রিত হইয়া পড়ে, মৃত্যুও ঠিক সেইভাবেই হয়—ঐ সময়ে লেশ মাত্র যন্ত্রণা হয় না।

২। মৃত্যুর ঠিক পরের ও পূর্ব্বের অবস্থার মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য থাকে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহার চরিত্র, চিন্তার ধারা, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া, প্রতিহিংসা প্রভৃতি যে ভাবের ছিল, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও তাহাই থাকে। পার্থক্য এই যে, তাহার জড়দেহের পরিবর্ত্তে সে সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য মানুষ অনেক সময় বুঝিতে পারে না যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মৃত্যুর পর অনেকে অল্পাধিক সময় অজ্ঞান অচৈতন্যভাবে থাকে। চেতনা হইবার পর যদি তাহারা দেখে যে তাহাদের আত্মীয় বন্ধুরা তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছে, সে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। তাহার পর সে অবশ্য বুঝিতে পারে যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

৩। ইহলোকে জড়দেহে আমাদের যদি কোনও প্রকার অঙ্গহানি হইয়া থাকে, ওপারে আমাদের নবীন সূক্ষ্মদেহে উহার কোনও চিহ্ন থাকে না। এপারের অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি ওপারে যাইয়া যখন জানিতে পারে যে, তাহাদের

অঙ্গের বিকলতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়াছে তখন তাহারা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে আনন্দিত হয়।

৪। প্রেত-লোকটা কোথায়? আমরা এ বিষয়ে প্রেতাত্মাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াছি। তাহাদের জ্ঞান হয় অসম্পূর্ণ নতুবা আমরা তাহাদের বর্ণনা ঠিক বুঝিতে পারি না। তাহারা বলে, প্রেতলোক ঠিক আমাদের জগতের পাশেই অবস্থিত। প্রেতলোকের অধিবাসীরা যেমন সূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত, ইহাদের জগতও ঠিক ঐ প্রকার সূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত। এই জন্য ইহা আমরা দেখিতে পাই না। ইহা খুবই সম্ভব মনে হয়। প্রেতলোক যেখানেই থাকুক ইহা যে আমরা আমাদের জড়চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইব না, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে জগতের অধিবাসীরা যে প্রকারের পরমাণু নির্ম্মিত হয়, ঐ জগতও ঠিক ঐ ভাবের হইবে।

প্রেতলোক অবিকল আমাদের জগতের মত। এই পৃথিবীতে যেমন নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেতলোকেও অবিকল তদ্রূপ। প্রেতাত্মারা বলে, তাহাদের জগতের নদ, নদী প্রভৃতি আমাদর নদ, নদী প্রভৃতি অপেক্ষা অনেকাংশে সুন্দর। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সেখানেও আলো বিকীর্ণ করে, কিন্তু সূর্য্যের আলোতে দাহিকা শক্তি নাই। ইহারকিরণ চন্দ্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতর বটে, কিন্তু অসহ্য নয়।

৫। প্রেতলোকে সকলে আমাদের মত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। পোষাক পরিচ্ছদ যে অবিকল আমাদের মত তাহা প্রেত-চক্রে আগত জড়দেহধারী প্রেতাত্মাদিগের পোষাক পরিচ্ছদে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রেতাত্মারা বলে যে, ঐ পোষাক পরিচ্ছদও অতি সূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত হয়। পাঠক মনে রাখিবেন, যে লোকের অধিবাসীরা যে প্রকার পরমাণু নির্ম্মিত হয়, সেখানকার সমস্ত দ্রব্যই ঐ জাতীয় পরমাণু নির্ম্মিত হইবে।

৬। পরলোকে লিঙ্গভেদ ঠিক আমাদের মত। কিন্তু যৌন-সম্মিলন না থাকাতে বিবাহ প্রথা আদৌ নাই এবং সন্তানাদি পালনের ঝঞ্ঝাট কাহাকেও সহিতে হয় না। এই-জন্য ওপারে সামাজিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের। বিবাহ বন্ধন নাই বটে, কিন্তু নরনারীর মনের মিল হইলে তাহারা একত্রে বাস করে। এপারের স্বামী-স্ত্রী যদি ওপারে যাইয়া দেখে যে তাহাদের মধ্যে প্রাণের মিলন অসম্ভব, তাহারা প্রয়োজন বোধ করিলে পৃথক পৃথক বাস করিতে থাকে। এপারে যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যৌবন অতীত হইলেও প্রাণে প্রাণে সম্পূর্ণ মিল থাকে, তাহারা ওপারে যাইয়াও একত্রে বাস করে।

৭। যে সকল শিশুরা অতি অল্প বয়সে ওপারে যায়, তাহারা ওপারেও এপারের মত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে

থাকে; এ জাতীয় শিশুদিগকে লালন পালন করিবার নির্দ্দিষ্ট লোক আছে।

৮। এপারের ধর্ম্মমত ওপারেও কিছুদিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। তাহার পর অনেকের উহা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যাহারা প্রেতলোক ছাড়িয়া উর্দ্ধতর লোকে যাইতে চায় তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এপারের সীমাবদ্ধ ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া মনকে অতি উচ্চস্তরে উন্নীত করিতে হয়, অর্থাৎ আমার ধর্ম্মই ঠিক, আর সমস্ত ভুল, অন্য ধর্ম্মের লোক সকল অতি হীন, তাহাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে নাই, প্রভৃতি ধারণা ত্যাগ করিতে হয়। যাহারা সকলকে সমান ভাবে ভালবাসিতে পারে এবং সকলকে সমানভাবে সেবা করে, তাহারাই ওপারে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহারা উচ্চতর লোকে চলিয়া যায়। সার্ব্বজনীন ভালবাসা, সার্ব্বজনীন সেবাই ওপারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

৯। সকলের মনে রাখা উচিত যে আমরা এপারে যেমনটি থাকি (অর্থাৎ আমাদের যে প্রকার ধর্ম্মমত, ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতি থাকে) ওপারে ঠিক সেইভাবেই উপস্থিত হই। মৃত্যুর ঠিক পরে তাহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। যদি ওপারে আমরা মনকে উন্নত করিতে পারি, আমরা অনায়াসে উচ্চতর লোকে গমন করি। এপারের সমস্ত ধর্ম্মমতই অনুন্নত, সেইজন্য প্রায়ই আমাদের মন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। এজগতের বোধ হয় প্রত্যেক লোকই মনে করে, তাহার ধর্ম্মই

প্রকৃত পথ আর সমস্ত ধর্ম্ম মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। ওপারে যাইবার পর যতদিন পর্য্যন্ত না এই প্রকার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় প্রেতাত্মাদের প্রেতলোকে থাকিতে হয়। ইহার পর স্বর্গলোক। মনের সঙ্কীর্ণতা যতদিন পর্য্যন্ত না দূরীভূত হয়, ততদিন প্রেতাত্মা উচ্চতর লোকে যাইতে পারে না।

১০। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন লক্ষ লক্ষ জগত আছে, যেখানে জড় ও সূক্ষ্মদেহধারী জীব বাস করে। উহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যেখানে আমাদের অপেক্ষা সকল বিষয়ে উচ্চতর জীব দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এমন বহুতর লোক আছে যেখানকার অধিবাসীরা আমাদের অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে নিকৃষ্ট। আমাদের জগতের লোকেরা মৃত্যুর পরে ঐ সমস্ত লোকে যাইয়া জন্ম গ্রহণ করে কিনা তাহা প্রেতাত্মাদের মধ্যে কেহই জানে না। প্রেতাত্মাদিগের মধ্যে অনেকে ইচ্ছা করিলে ঐ সকল লোকে গমনাগমন করিতে পারে।

১১। আমরা কয়েক জন হিন্দু প্রেতাত্মাকে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। দেখিলাম এ বিষয়ে তাহাদের সকলের একমত। তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—যাহারা মনে করে মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের বিশেষ আবশ্যক, তাহাদের প্রেতাত্মার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে ঐ সকল

প্রেতাত্মা পরলোকে আদৌ শান্তি পায় না। তবে যাহারা ইহা নিরর্থক মনে করে তাহাদের জন্য শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলে কোনও ফল হয় না। একটা কথা কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। ইহলোকে যদি কেহ দূষিত জীবন যাপন করে, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দ্বারা তাহার ঐ সকল অন্যায় কার্য্যের কোনও শাস্তি হয় না। ইহলোকে অন্যায় কার্য্য করিলে তাহা হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় পরলোকে উহার জন্য অনুতাপ করা।

১২। 'ভূতে পাওয়া' যে অমূলক কু-সংস্কার নয় ইহা আমরা প্রেতাত্মাদিগের নিকট হইতে সর্ব্বত্র জ্ঞাত হইয়াছি। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে। আমাদের বাসনা সকল মৃত্যুর পর প্রেতাত্মার সহিত ওপারে গমন করে। ওপারে জড়দেহ না থাকাতে ঐ সকল বাসনার পরিতৃপ্তির কোনও উপায় নাই। অনেক দুষ্ট প্রেতাত্মা নিজের অতৃপ্ত প্রবৃত্তি তৃপ্তির জন্য সুযোগমত এপারের কোনও জীবের জড়দেহ আশ্রয় করে। মানুষের সমস্ত বাসনার মধ্যে কাম প্রবৃত্তিটাই বিশেষভাবে দুর্দ্দমনীয় এই জন্য ওপারের পুরুষ প্রেতাত্মারা প্রায়ই এপারের কোন যুবতীর দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। পাঠকেরা যদি বিশেষ নিরপেক্ষভাবে 'ভূতে পাওয়া' ব্যাপারগুলির বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা দেখিবেন ঐ সকল রোগী বা রোগিণীর (কাহাকেও ভূতে পাইলে লোকে অনেক সময় মনে করে উহারা কোনও অজ্ঞাত

পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে) উপর প্রকৃতই প্রেতাত্মার হইয়াছে।

১৩। মৃত্যুর পর অনেককে যে আবার এপারে ফিরিয়া আসিতে হয় ইহা সমস্ত প্রেতাত্মাই স্বীকার করে। যতদিন পর্য্যন্ত না এপারের জীবাত্মা ওপারের উপযুক্ত হয়, ততদিন তাহাকে ঘোরাঘুরি করিতে হয়। প্রবৃত্তি সকলের নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও প্রেতাত্মাই প্রেতলোকের উপযুক্ত হয় না। ওপারের প্রত্যেক প্রেতাত্মাকে (সে যত বড় মহা পাপীই হউক না কেন) অতৃপ্ত বাসনা দমনের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট সময় (Trial) দেওয়া হয়।

১৪। পূনর্জন্মের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় বাসনাহীন হওয়া বা ষড়রিপু দমন করা। মানুষ যতই পূজাপাঠ করুক না কেন প্রবৃত্তি দমন না হইলে আবার ওপার হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়।

১৫। প্রেত-চক্রে আগত কয়েকজন প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে প্রেতলোকের "পরেও কোনও লোক আছে কি না? সমস্ত প্রেতাত্মার নিকট হইতে আমরা একই প্রকার উত্তর পাইয়াছিলাম। উত্তর এই :—প্রেতলোকের উপর যে আরও দুইটি লোক আছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার পর আর লোক আছে কি না সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ দেওয়া যায় না। প্রেতলোকের পর স্বর্গলোক। আমাদের লোক হইতে যখন কোনও জীবাত্মা প্রেতলোকে

বৰ্ত্তমানে তাহার দেহ সূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত হয়। সেইজন্য আমরা জড়চক্ষু দ্বারা ঐ সকল প্রেতাত্মাকে দেখিতে পাই না। প্রেত-লোক হইতে কোনও জীবাত্মা যখন স্বর্গলোকে যায়, তখন তাহার দেহ অতি সূক্ষ্ম পরমাণু নির্ম্মিত হয়, সেই জন্য প্রেত-লোকবাসীরা উহাদিগকে দেখিতে পায় না। স্বর্গবাসী কেহ যদি প্রেতলোকের কাহাকেও দেখা দিতে চায়, তাহাদের নিজের দেহকে প্রেতলোকের পরমাণু দ্বারা গঠন করিতে হয় (যেমন প্রেতলোকের কেহ আমাদিগকে দেখা দিতে চাহিলে তাহাকে আমাদের মত জড়দেহ গ্রহণ করিতে হয়)। এই ভাবে স্বর্গ-লোকের উপরে যদি কোন লোক থাকে, উহার অধিবাসী-দিগকে স্বর্গের অধিবাসীরা দেখিতে পায় না।

স্বর্গলোক হইতে জীবাত্মারা কখন কখন প্রেতলোকে আসিয়া থাকে, কিন্তু উহার উপরের লোকের অধিবাসীরা প্রেত লোকে কখনও আসে না। এই সব কারণে প্রেতলোকের জীবাত্মারা স্বর্গলোকের পর কি আছে তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত নয়।

১৬। মৃত্যুর পর প্রায় সমস্ত জীবাত্মাকে প্রেতলো[কে] যাইতে হয়। যাঁহারা ইহলোকে কঠিন সাধনাবলে ক্রোধ প্রভৃতির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন সমস্ত জীবকে সমভাবে দেখিতে শিখিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে প্রেতলোক অতিক্রম করি[য়া] করেন। এ-প্রকার মুক্তজীব এই জগতে